আখবারে তওহীদ

অক্টোবর-২০২২ | শহীদ সুজন স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

কাভার স্টোরি **শহীদরা মরে না, ইতিহাস গড়ে**

ঘটনাবলি : মোজাহেদার গায়ে হাত দেয়ায় জুতাপেটা
মানতের তাৎক্ষণিক ফল
মোজাহেদার হুঙ্কার: **“হু আর ইউ?”**
মেরামত ছাড়াই ঠিক হল নষ্ট ফোন

স্মৃতিচারণ
মহামান্য এমামুয্‌যামানের ড্রাইভিং

ভ্রমণ কাহিনী : প্রশাসনিক বালাগ ও হাওরদ্বীপ খ্যাত খালিয়াজুড়ি ভ্রমণ
কৃষি সংবাদ : গোপালগঞ্জের কৃষি প্রকল্পে ঘাম ঝরানো দিন

মানার বিনতে মোকসেদ

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ধর্মব্যবসায়ীদের দৈনিক দেশেরপত্র পত্রিকার বিরুদ্ধে করা মিছিলের একটি দৃশ্য পেন্সিলের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মানার বিনতে মোকসেদ। তিনি নরসিংদী শাখার সদস্য।

মেহার বিনতে মতিন

হেযবুত তওহীদের এক মোজাহেদার পত্রিকা বালাগের দৃশ্য রং পেন্সিলের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মেহার বিনতে মতিন (১১)। তিনি নারায়ণগঞ্জ শাখার সদস্য।

পাথেয়

আল্লাহর বাণী

‘মো’মেনদের বক্তব্য তো কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম।’ (সুরা নুর- ৫১)।

রসুলাল্লাহর বাণী

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন রসুল (সা.) একবার আমাদেরকে ইরশাদ করলেন, “তোমরা সালাতে এমন সারিবদ্ধভাবে কেন দাঁড়াও না যেভাবে মালায়েকরা আপন রবের নিকট কাতারবন্দী হয়ে থাকেন? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, মালায়েকরা কীভাবে তাদের রবের নিকট কাতারবন্দী হয়ে থাকেন? রসুল (সা.) ইরশাদ করলেন, তাঁরা কাতার সম্পূর্ণ করেন এবং মিলেমিশে দাঁড়ান যেন দুইজনের মাঝে খালি জায়গা না থাকে।
[সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) - ৮৫২]

মহামান্য এমামুয্যামানের বাণী

“তোমরা মোখলেস মোজাহেদ-মোজাহেদারা সতর্ক থাক। বিশেষ করে আমার বক্তব্য মোখলেস মোজাহেদ মোজাহেদাদের প্রতি, যারা হেযবুত তওহীদের মানে অর্থাৎ সত্য বুঝতে পেরেছ, তারা ঐক্য বিনষ্টকারীদের ফাঁদে পা দিও না। যে মুহূর্তে বুঝতে পারবে যে, কোনো লোক জাতির ঐক্য নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, শৃঙ্খলা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে, সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। আর যদি রুখে না দাঁড়াও, বুঝতে হবে তুমি মোখলেস না। আল্লাহ তোমাকে হেযবুত তওহীদের এই জায়গা থেকে নিয়ে মোনাফেকদের সাথে শামিল করে দেবেন। যে মোনাফেকদের জায়গা একদম জাহান্নামের নিম্নস্তরে।”

মাননীয় এমামের বাণী

“হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদাদের সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক, জীবনে যত উত্থান পতন ঘটুক জেহাদ থেকে আমরা বিচ্যুত হব না। সত্য বুঝার পর, জান্নাতের পথ পাওয়ার পর জীবনে যত দুঃখ বেদনাই আসুক তা উপেক্ষা করে জেহাদ করে যাব, আন্দোলন থেকে নিষ্ক্রিয় হব না, হারিয়ে যাব না। এই সংকল্প তাদের করতে হবে। মানুষের জীবন একরকম থাকে না, জীবনে দিন আছে রাত আছে। এজন্য জীবনে যাই ঘটুক আমি হেযবুত তওহীদ থেকে নিষ্ক্রিয় হব না যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকব, সক্রিয় থাকব এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”

সূচিপত্র

- শহীদরা মরে না, ইতিহাস গড়ে ৩
- মাননীয় এমামুয্যামানের হাজতবাস ৮
- মাননীয় এমামুয্যামানের ড্রাইভিং ৯
- একজন মহান মানুষের দর্শনলাভ ১১
- তারেকুয্যামান সানি: অকালে ঝরল যে নক্ষত্র ১৩
- অস্তিত্ব রক্ষার ব্যর্থ সংগ্রামরত 'মান্দাই সম্প্রদায়'! ১৭
- সংবাদ পাতা: সোনারগাঁয়ে সপরিবারে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ১৯
- সংবাদ পাতা: মোজাহেদার হুঙ্কার: "হু আর ইউ?" ২৫
- ভ্রমণ পাতা: প্রশাসনিক বালাগ ও হাওরদ্বীপ খ্যাত খালিয়াজুড়ি ভ্রমণ ২৭
- ভ্রমণ পাতা: মাইলফলক ছোঁয়ার আনন্দ ২৯
- সাহিত্য পাতা: কবিতা ৩০
- সাহিত্য পাতা: দরজা -ডা. শাহীন মাহমুদ ৩২
- কুইজ ৩৫
- বিগত সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া ৩৫
- শিল্প বাণিজ্য: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের মাঝে কে আর ফ্যাশন! ৩৬
- শিল্প বাণিজ্য: নারী উদ্যোক্তা ফাতেমা রুহি ৩৭
- আত্মরক্ষা সবার নাগরিক অধিকার ৩৮
- কৃষিপাতা: গোপালগঞ্জ কৃষি প্রকল্পের ঘামঝরানো দিন ৩৯
- স্বাস্থ্য পাতা: আমাদের শরীরে স্বাস্থ্যকর ঘুম ৪১
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু হতে পারে জাতির সম্পদ ৪৩
- নোয়াখালীতে জুম'আ ও আমার উপলব্ধি ৪৬
- মাননীয় এমামের পেজে করা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট ৪৮

সম্পাদকীয়

শহীদ সুজন আন্দোলনে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা

আখবারে তওহীদের সকল পাঠককে শুভেচ্ছা। গত সংখ্যা প্রকাশের পর পরই বেশ কয়েকটি ঘটনা গোটা হেযবুত তওহীদকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে বুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগের ছাত্র তারেকুয্যামান সানির পদ্মা নদীতে ডুবে পর্দা করার দুঃখজনক ঘটনাটি আন্দোলনের সদস্যদেরকে বিমূঢ় করেছে। এর রেশ কাটতে না কাটতেই পাবনায় শহীদ হলেন সুজন মণ্ডল। নিজের রক্ত ঢেলে দিয়ে আন্দোলনের সকল সদস্যকে রাজপথে নামালেন তিনি। হেযবুত তওহীদে নতুন মাত্রা যুক্ত করলেন শহীদ সুজন। তাঁর হত্যার প্রতিবাদের দাবি নিয়ে হেযবুত তওহীদ সারাদেশের গণমাধ্যম ও প্রশাসনের সামনে নতুন ও বৈপ্লবিক মূর্তিতে আবির্ভূত হল। একজন শহীদ কীভাবে লক্ষ মো'মেনকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন তার দৃষ্টান্ত শহীদ সুজন। তাই এই সংখ্যার প্রচ্ছদ সাজানো হয়েছে তাঁকে নিয়েই।

আখবারে তওহীদ পত্রিকাটির জন্ম হয়েছিল মহামান্য এমামুয্যামানের চিন্তা থেকে। এজন্য পত্রিকাটি আমাদের আর দশটা প্রকাশনার মত নয়, এর সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে আছে। এবারেও তাই শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের লিখনী থেকে পাওয়া মহামান্য এমামুয্যামানের বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা সংযুক্ত করা হয়েছে। আন্দোলনের প্রায় ত্রিশটি বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতিকে আন্দোলনের সকল ভাইবোনদের সামনে তুলে ধরা আমাদের একটি অভিপ্রায়। এর সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় কয়েকটি বিভাগের নিজস্ব সংবাদ এ সংখ্যাতেও স্থান পেয়েছে। যে বিভাগগুলোর সংবাদ ছাপা গেল না সে বিভাগগুলোর দায়িত্বশীলগণ পরবর্তী সংখ্যায় নিজেদের কার্যক্রমকে তুলে ধরতে উৎসাহী হবেন এমন আশা রইল।

চলমান নানা কর্মসূচির তুমুল তরঙ্গের মাঝে আখবারে তওহীদ হারিয়ে যাক এটা আশা করি কারো কাম্য নয়। এ পত্রিকা হেযবুত তওহীদের পদক্ষেপগুলোকে ইতিহাস হিসাবে সংকলিত করতে ভূমিকা রাখতে পারে, তাই এর গুরুত্ব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের দিকে প্রসারিত। তবে সকল জেলার সাহিত্য সম্পাদকদের সংবাদ প্রেরণে সক্রিয়তা না থাকলে আখবারে তওহীদ নিয়মিত প্রকাশিত হলেও অভ্যন্তরীণ সংবাদমাধ্যম হিসাবে তার পরিচয় হারাবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। এজন্য আমাদের প্রয়োজন সকল পর্যায়ের সম্মানিত আমিরদের আন্তরিক সহযোগিতা।

বিলম্ব কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়, তবু আমাদের লোক স্বল্পতা ও অদক্ষতার কারণে এবারের আখবারে তওহীদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে বিলম্ব হয়েই গেল। গত সংখ্যার পত্রিকাটি যারা পড়েছেন তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে এবারের পত্রিকাটি সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকজনের পাঠ প্রতিক্রিয়াও প্রকাশিত হলো। পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমরা লিখিতভাবে পেলে এটি একটি নিয়মিত পৃষ্ঠা হিসাবে যেতে পারে। আমরা মনে করি, হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক সদস্যই আখবারে তওহীদের লেখক। প্রয়োজন শুধু দেখার দৃষ্টি ও লেখার আগ্রহ।

সবাইকে ধন্যবাদ।

শহীদরা মরে না, ইতিহাস গড়ে

আলমাস হাসান মাহদী

শহীদ মো. সুজন মণ্ডল

গত ২৩ আগস্ট ২০২২। হেযবুত তওহীদের ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হলো আরও একটি স্মরণীয় দিন। আমরা হারালাম আমাদের আত্মার প্রিয় সুজন ভাইকে। আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে অন্তরের ভালোবাসা নিয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন তিনি। তিনি যোদ্ধা, তিনি শহীদ। তিনি আছেন আমাদের সকলের হৃদয়ে। তার এই ত্যাগের বিনিময়ে উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা।

পিতা-মাতাহীন মো. সুজন মণ্ডল প্রায় তিন বছর আগে তওহীদের ছায়াতলে আসেন। তখন থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় একজন মোজাহেদ হিসেবে আন্দোলনের সকল কাজে সকল আহ্বানে যুক্ত হন তিনি। করোনাকালীন সময় তিনি মাননীয় এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে নোয়াখালী যান। সেখানে তিনি দুই বছর কৃষিকাজ ও মসজিদ নির্মাণ কাজে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রযুক্তি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি গম ভাঙানোর মেশিন তৈরি করেছেন। মাননীয় এমামসহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা সেই আটার রুটি খেয়েছেন পুরো লকডাউনের সময়জুড়ে। পরিশ্রমী মিষ্টভাষী সদা হাস্যোজ্জ্বল বিনয়ী সুজনের সংসারে তার ভাইবোন ও স্ত্রীকে নিয়ে ছিল সুখের পরিবার। পেশায় ওয়ার্কশপ মিস্ত্রি সুজন নয় বছর আগে ভালোবেসে জীবনসঙ্গী হিসেবে বিয়ে করেছিলেন শাহানা খাতুনকে। বর্তমানে নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা শাহানা খাতুন। কিন্তু নয় বছর অপেক্ষার পর বহু প্রতীক্ষিত সন্তানের মুখ আর দেখা হলো না সুজনের। সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলায় অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

- **সেদিন রাতে যা ঘটেছিল...**

ওইদিন মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে পাবনা শহরের চরঘোষপুর ৮নং ওয়ার্ডের ভাটামোড় এলাকায় অবস্থিত হেযবুত তওহীদের অফিসে জেলা আমির সেলিম শেখ প্রতিদিনকার মতো আন্দোলনের ভাইদের নিয়ে আলোচনা করতে বসেন। এসময় জেলা আমির সেলিম শেখ, মো. সুজন ও আমিনুলসহ আরও কিছু ভাইকে নিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথবার্তা বলছিলেন। এমন সময় স্থানীয় একদল সন্ত্রাসী চাপাতি, হাতুড়ি, হাঁসুয়া, রড, জিআই পাইপ, লাঠি নিয়ে ভাটামোড়ে অবস্থিত অফিসের দিকে মিছিল নিয়ে আসে। অফিসে ঢুকে তারা কিছুক্ষণ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করে। কিন্তু মিছিলকারীরা প্রকৃতপক্ষে হামলার জন্য অস্ত্রপাতি নিয়েই এসেছিল। তাই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা আক্রমণ করে বসে। প্রথমে আমির সেলিম শেখের ওপর হামলা চালায় সশস্ত্র হামলাকারীরা। তাকে চাপাতি দিয়ে কোপ দিতে আসে একজন। তিনি তা লাঠি হাতে প্রতিহত করেন। পরে আবারো তার মাথা লক্ষ্য করে চাপাতি চালানো হয়। পেছন থেকে তখন সুজন মণ্ডল তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে চাপাতির কোপটি ফিরিয়ে

পত্রিকা বালাগে শহীদ মো. সুজন মণ্ডল।

পাট ক্ষেতে নিড়ানির কাজ করছেন শহীদ মো. সুজন মণ্ডল।

পত্রিকা বালাগ শেষে এক ভাইয়ের সাথে টাকার হিসাব মিলাচ্ছেন শহীদ মো. সুজন মণ্ডল।

দেন। কিন্তু চাপাতির আঘাতটি এত মারাত্মক ছিল যে তার হাত থেকে লাঠিটি ছুটে যায়। ঠিক তখনই পেছন থেকে আরেকজন বড় হাঁসুয়া (চিকন ও লম্বা ফলার দা) দিয়ে সুজনকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোপাতে থাকে। সুজন মাটিতে পড়ে যায়। তখন তাকে কয়েকজন মিলে কোপাতে শুরু করে। একজন হামলা কারী তার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। ফলে তাঁর ফুসফুস ফেটে যায়। নির্মমভাবে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তারা সুজনকে রাস্তায় ফেলে যায়। অন্য সদস্যরাও সাহসিকতার সঙ্গে, বীরত্বের সঙ্গে হামলাকারীদের মোকাবেলা করেন। তাদের প্রতিরোধের মুখে হামলাকারীরা পিছু হটে চলে যায়। তারা আবারও সংঘবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে কিন্তু মোজাহেদদের সামনে আর দাঁড়াতে পারে না। এরই মধ্যে পুলিশকে ফোন করে খবর দেওয়া হয়। গাড়িতে করে পুলিশ স্টেশনের দূরত্ব মাত্র সাত/আট মিনিটের রাস্তা হলেও পৌনে এক ঘণ্টা সময় পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। আক্রমণকারীরা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে। মোজাহেদরা এই আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে এক মহূর্তের জন্যও পিঠ দেখাননি, পিছু হটেননি। দীর্ঘ সময়ের এই সংর্ঘষে গুরুতর আহত হন মাত্র তিনমাস আগে আন্দোলনে যোগদান করা আমিনুল ইসলাম। তাছাড়া সন্ত্রাসীদের আঘাতে সেখানে উপস্থিত সকলেই আহত হন।

- **হাসপাতালে রক্তক্ষরণের মুহূর্তগুলো**

আহতদেরকে প্রথমে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা গুরুতর আহত সুজন মণ্ডল ও আমিনুল ইসলামকে জরুরি চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। দ্রুততার সাথে এম্বুলেন্সে করে তাদেরকে রাজশাহী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের দুজনেরই মাথার গভীর আঘাত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল অবিরাম। তাদের প্রয়োজন ছিল আই.সি.ইউ- তে নিয়ে কৃত্রিম লাইফ সাপোর্ট দেওয়া। কিন্তু দেখা গেল আই.সি.ইউ-তে বেড ছিল মাত্র একটি আর সেখানে মোজাহেদদের আগেই আরো ১৫ জনের সিরিয়াল পড়ে আছে। ফলে সংকটমুহূর্তে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হল না তাদেরকে। একটা পর্যায়ে সুজনের অক্সিজেন লেভেল অনেক নিচে নেমে যায়। রাত আড়াইটার দিকে সুজন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

- **সারাদেশে বিক্ষোভ**

রাতেই সারা আন্দোলনে খবরটি বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয় পাবনার অফিসে হামলা ও সুজন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ। ঢাকা মহানগর হেযবুত

তওহীদের উদ্যোগে সকাল দশটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ প্রায় তিনশো'র বেশি মোজাহেদ-মোজাহেদা উপস্থিত হন। সেখানে তারা সুজন হত্যার বিচারের দাবিতে বক্তব্য রাখেন। একই দিনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, নীলফামারী, নরসিংদী ও বরিশাল। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতেও ক্রমান্বয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সারাদেশে হেযবুত তওহীদ নিয়ে একটি সাড়া পড়ে যায় যা শহীদ সুজনের আত্মদানের বিনিময়ে হেযবুত তওহীদ লাভ করে।

• **শহীদের রক্তের খুশবু**

পাবনা শহরের স্বাধীনতা চত্বর মাঠে বাদ মাগরিব মো. সুজনের জানাজার নামাজের অনুষ্ঠান ঠিক করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর বিভাগীয় আমির ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমির নিজাম উদ্দিন, খুলনা ১ বিভাগীয় আমির শামসুজ্জামান মিলন, খুলনা ২ বিভাগীয় আমির মোতালিব খান, পাবনা জেলা আমির সেলিম শেখ, রাজশাহী জেলা আমির তোতা শেখসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলগণ। পাবনাসহ আশপাশের জেলাগুলো থেকে শত শত মোজাহেদ সেখানে উপস্থিত

শহীদ হবার ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পরেও শহীদ সুজনের মাথার জখম থেকে তাজা রক্ত ঝরছিল।

হন। তারা পাবনার স্বাধীনতা চত্বর মাঠে জামাতে মাগরিবের সালাহ করেন। সকাল থেকেই পাবনা শহরে এবং আমাদের সদস্য-সদস্যাদের ভেতরে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। সবাই ছিলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ন। তারা চাপা কষ্ট নিয়ে কাতারে কাতারে জানাজার জন্য সারিবদ্ধ হন। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাগরিবের পরে শহীদ সুজনের লাশ অ্যাম্বুলেন্সে করে মাঠে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ১৭ ঘণ্টা পরেও শহীদ সুজনের মাথা থেকে তরতাজা রক্ত ঝরছিল, ভিজে যাচ্ছিল কাফনের কাপড়। শহীদের রক্ত দৃষ্টিগোচর হতেই আকস্মিক এক পরিবর্তনের ঢেউ খেলে যায় উপস্থিত মোজাহেদ মোজাহেদাদের ধমনীতে। সারাদিনের সকল জড়তা, হতাশা, বিষণ্নতা কাটিয়ে সবাই যেন শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল ও ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড এক চেতনার আগুণ ছড়িয়ে পড়ে। তারা যে কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পূর্ণ মনোবল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। অপেক্ষা শুধু মাত্র একটি হুকুমের। তাদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় পাবনা শহর। প্রশাসনের লোকেরা চাচ্ছিল দ্রুত শহীদ সুজনকে কবরস্থ করে ফেলতে, যেন এটা নিয়ে আবারও কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। শহীদ সুজনের আত্মীয় স্বজনরা আগের দিনের ঘটনায় একটু ভীত-শঙ্কিত হয়ে থাকলেও এ সময়ে এসে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের যারা নীরব সমর্থক ছিল তারাও যেন জীবন ফিরে পায়। প্রথমদিকে জানাজাস্থলে লোকজন কম থাকলেও পরে আর তিল ঠাঁই থাকে না। উপস্থিত আমিরদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জানাজায় অংশ নেওয়া মুসুল্লিগণ। রাত আটটার দিকে জানাজা শেষে পাবনা শহর থেকে তাকে তার নিজ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েক কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে মানুষের ঢল নামে। শহীদ সুজনকে এক নজর দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোকজন জড়ো হতে থাকে। তার বাড়ির পাশের স্কুল মাঠে দ্বিতীয় জানাজার নামাজের আয়োজন করা হয়। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে যেখানে সুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এখন সেখানেই হাজার হাজার মানুষের ভীড় যারা সুজনের শেষ যাত্রার সঙ্গী হতে এসেছে। তাদের চোখে অশ্রু। তারা সন্ত্রাসীদের প্রতি ঘৃণা বর্ষণ করতে করতে দ্বিতীয় জানাজায় অংশ নেয়। হেযবুত তওহীদের একজন সদস্যর জানাজায় এতো মানুষ হবে সেখানকার লোকজন ও পুলিশ বাহিনী সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। তারা দেখলো শহীদ সুজনের রক্ত তখনও তার দেহ থেকে ঝরে পড়ছে। খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী শাহরুল ইসলাম শহীদের রক্ত কেন এখনও জমাট বাঁধেনি, কেন তার শরীরে রাইগর মর্টিস হয়নি তা উপস্থিত লোকদেরকে

বুঝিয়ে বলেন। এটা শুনে সুজনের গ্রামবাসী যারা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচারে বিশ্বাস করত তাদের ভুল ভেঙে যায়। তারা বুঝতে পারে যে সুজন সঠিক পথেই ছিলেন, তিনি শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন বলেই এমন ঘটেছে।

• **নতুন যুগের সূত্রপাত**

হেযবুত তওহীদের প্রথম শহীদ মো. সাইফুল্লাহ। আজ থেকে ১৯ বছর আগে ২০০৩ সালে ধর্মব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের আঘাতে শহীন হন তিনি। প্রকৃত ইসলামের ডাক নিয়ে বরিশাল থেকে একটি টিম বালাগের উদ্দেশ্যে মাদারীপুরে যায়। সেসময় বালাগরত অবস্থায় শহীদ সাইফুল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করে ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা। বিচার চাওয়া দূরে থাক, সে সময়টায় আন্দোলনের অবস্থা এমন ছিল যে, তার লাশ থানা থেকে নিয়ে আসাটাও একটা ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় ছিল। কারণ তখন ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার অপপ্রচারে প্রভাবিত ছিল প্রশাসন। তারা ভাবতো হেযবুত তওহীদ একটি জঙ্গি সংগঠন। প্রতিনিয়ত মিথ্যা মালার শিকার হয়ে আন্দোলনের সদস্যদেরকে জেলহাজতে যেতে হত, রিমান্ডের নামে নির্যাতনের শিকার হতে হত। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে কুষ্টিয়ার যুগিয়াতে ধর্মব্যবসায়ীরা হেযবুত তওহীদ সদস্যদের বাড়িতে হামলা চালায়। নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করা হয় বর্ষিয়াণ মোজাহেদা রাবেয়া খাতুনকে। এভাবে ধর্মব্যবসায়ীরা ও ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা এ পর্যন্ত চার শতাধিকবার হেযবুত তওহীদ সদস্যদের উপর বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়েছে। মামলা হামলা ও শহীদের রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ আস্তে আস্তে এই আন্দোলনের অবস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন। এর মাঝে আমাদের আত্মার পিতা মাননীয় এমামুয্যামান আমাদের রেখে চলে যান। ২০১৬ সনে শহীদ হলেন খোকন ও রুবেল। এই প্রতিটা ধাপে ধাপে আন্দোলন নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। এসেছে নতুন কর্মসূচি। এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকেনি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এভাবে শহীদের ত্যাগের বিনিময়ে মো'মেনদের চেষ্টায় হেযবুত তওহীদ এগিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। শহীদ সুজনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ইতোমধ্যেই নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে বিজয়ের সংগ্রাম।

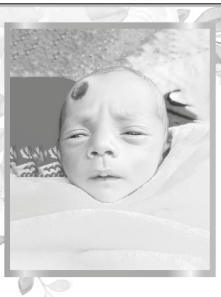

নতুন মুখ

নবজাতক: মো. রিফাত রানা
পিতা: মোহাম্মদ সুফিয়ান মিয়া
মাতা: মোছাঃ রিনা বেগম
জন্ম তারিখ : ০৩/০৮/২২, রোজ বুধবার
নবজাতকের বাবা-মা সন্তানের জন্য মো'মেন-মো'মেনাদের কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করেছেন।

নতুন মুখ

গত ১৫/০৪/২২ ইং তারিখে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানা আমির মো. আজগর আলী রাজন ও লামিয়া আক্তার তৃষার একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে আরিশা ইসলাম রাফা। রাফা যাতে অনেক বড় মোজাহেদা হতে পারে, সেজন্য তার বাবা-মা দোয়া চেয়েছেন।

নতুন মুখ

নবজাতক: ফাতেমা আতিয়া বিনতে মোর্শেদ
পিতা: মোর্শেদ আলম মিয়া
মাতা: শরুফা আক্তার আয়েশা
শাখা: নোয়াখালী।
জন্ম তারিখ: ১৮/০৮/২০২২
নবজাতকের বাবা-মা তাদের সন্তানের জন্য মো'মেন-মো'মেনাদের কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করেছেন।

(প্রথম পর্ব)

মাননীয় এমামুয্‌যামানের হাজতবাস ও রিমান্ডের দিন

আব্দুর রকিব

গ্রেফতারের পর রমনা থানার বারান্দায় লেখকের সঙ্গে মহামান্য এমামুয্‌যামান। তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩। এই দিন মাননীয় এমামুয্‌যামানকে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়। তখন আমি মাননীয় এমামুয্‌যামানের চিকিৎসা সহকারী হিসাবে চেম্বারে থাকতাম। আমাকেও মগবাজার ইস্কাটন রোডের মাননীয় এমামুয্‌যামানের চেম্বার সেলিম'স ক্লিনিক থেকে গ্রেফতার করা হয়। রমনা থানার সামনের রুমে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম থানার গারদ থেকে পায়চারি করতে করতে বের হয়ে আসলেন এমামুয্‌যামান।

এমামুয্‌যামান যে অ্যারেস্ট হয়েছেন এটা আমি জানতাম না। আমি জানি আমি একাই অ্যারেস্ট হয়েছি। এমামুয্‌যামান আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'তোমারেও নিয়া আইছে?' জবাবে আমিও হাসলাম। এমামুয্‌যামানের সাথে বসলাম, তিনি কীভাবে অ্যারেস্ট হলেন শুনলাম। এর মধ্যেই এমামুয্‌যামান বললেন, 'একটু চা পাওয়া যায় নাকি দেখ।' কারণ দীর্ঘক্ষণ এমামুয্‌যামান চা না খেয়ে আছেন। ৫টার সময় অ্যারেস্ট হয়েছেন, আর আমার সাথে দেখা হয়েছে প্রায় ৭টা-সাড়ে ৭টা বাজে। ঠিক এসময় একজন দারোগার সাথে আমার পরিচয় হয়ে যায় আমার সাথে। তার কাছে আমি অনুরোধ করি আমাদের একটু চা খাওয়ানো যাবে কিনা। উনি বললেন, 'তোমাদের তো এখানে রাখবে না, তোমাদের নিয়ে যাবে নারায়ণগঞ্জ।' তখন জানলাম যে নারায়ণগঞ্জের মামলা। এর আগ পর্যন্ত আমি জানি না কোথাকার মামলা বা কী বিষয়।

চা নিয়ে আসার আগেই আমাদের ডাক পড়ল। এমামুয্‌যামান আমি এক গারদে আর পাশের গারদে রাশেদ আর আলমগীর ভাই। এমামুয্‌যামান আর আমার দুজনের হ্যান্ডকাফ একসাথে। আমার ডান হাত আর এমামুয্‌যামানের বাম হাত। হ্যান্ডকাফ একটু টান লাগলে টাইট হয় এজন্য আমি এবং এমামুয্‌যামান এইভাবে হাতধরে হাঁটছি যাতে টান না লাগে। অলরেডি একবার টান লেগেছে। টান লেগে চেপে গেছে, চেপে গেলে ওরা লুজ করে দেয় না। এমামুয্‌যামানের আরেক হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। কলাপসিবল গেটটার কাছে দুইটা কনস্টেবল দাঁড়ানো দুইপাশে। তাদের একজন আরেকজনকে বলছে, 'দেখ দেখ! ইসলামের কথা কয় আর গাঁজা খায়।' কথাটা কানে এসেছে আর আমি দাঁড়িয়ে গেছি। এমামুয্‌যামান আমাকে চাপ দিয়ে টান দিলেন, বুঝলাম তিনিও শুনেছেন কথাটা। আমি একটু তাকিয়ে দেখলাম কনস্টেবলকে। থানার সামনে আমাদের ছবি তুলল মামুন ভাই। তিনি গোয়েন্দা রিপোর্ট নামে একটি পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ করতেন। বুঝলাম আন্দোলন থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে খবর নেওয়ার জন্য।

পিকআপে উঠলাম। এমামুয্‌যামান বললেন, 'এত রাগ করো কি জন্যে। বলছে বলুক, চিনে রাখ। চিনে রাখ। পরে দেখলে চিনবে না।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এমামুয্‌যামান চিনব।' তারপর আমাদেরকে ডিবির গাড়িতে করে পুলিশ প্রহরা দিয়ে নিয়ে গেল নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায়। ফতুল্লা থানায় গিয়ে যে অবস্থা দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। কয়েকশত মানুষ দেখলাম মনে হয় চরমোনাইয়ের অনুসারী। দাড়ি টুপিতে থানা বারান্দা বোঝাই। পিকআপ যাওয়ার সাথে সাথে হুলুস্থুল লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিস প্রোটেকশান দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে সোজা ওসির রুমে ঢোকাল। ঢোকার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল ছবি তোলা। যত সাংবাদিক জমেছিল এতক্ষণ। আর এমামুয্‌যামান ওদের হুলুস্থুল দেখে হাসছেন আর বলছেন যে, 'কী হইছে? ওরা এইরকম করে কেন?' মনে হয় যেন বড় একটা কিছু করে ফেলছে এমন একটা ব্যাপার। বেশ কিছুক্ষণ ছবি তোলার পর ওরা যখন থামেই না, পরে এমামুয্‌যামান দারোগাকে বললেন, 'বন্ধ করতে বলেন না, হইছে তো অনেক, আর কত!' পরে দারোগা ছবি তোলা বন্ধ করে ওদেরকে বের করে দিল।

এরপর থানার ফরমালিটি, নাম ঠিকানা লেখা, মালপত্র জমা দেওয়ার পর আমাদের তিনজনকে থানা গারদে ঢুকিয়ে দিল আর এমামুয্যামানকে চেয়ারে বসিয়ে রাখল সেকেন্ড অফিসারের টেবিলে। গারদের মধ্যে তিনজন, আর কোনো আসামি নেই। ভোর রাত্রে কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি। এর ভিতর শুধু চিন্তা করছিলাম এই বুঝি পুলিস ডাকবে, কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যাক সকালে ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙ্গার পরে দেখলাম যে এমামুয্যামান হাঁটাহাটি করছেন। এমামুয্যামান হ্যান্ডকাফ খোলা, এই বারান্দা এই টেবিল হাঁটছেন, পায়াচারি করছেন।

পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে সকালে মামুন ভাই, হুদা ভাই আর কে যেন গেছেন আমাদের খবর নেওয়ার জন্য সাংবাদিক হিসাবে। এর আগেই মামুন বলে দিয়েছিলেন যে আমরা প্রশ্ন করব আপনাদেরকে। অন্য সাংবাদিকরা যাতে প্রশ্ন করার সুযোগ না পায়। অনেক সাংবাদিক জমা হয়েছে। মামুন ভাই দুতিনটা প্রশ্ন করেছিলেন আমাদেরকে। আমরা উত্তর দিয়েছি। এমামুয্যামান তখনও হাঁটাহাঁটি করছেন। বন্দী কিন্তু বন্দী না। প্রথম রাত গেল।

দ্বিতীয় রাতে সম্ভবত এমামুয্যামানকেও গারদে ঢুকাল। আমাদেরকে যে গারদে রেখেছিল তার দুটা গারদের সামনের পরেরটা, সেটা পুরুষ গারদ। আমাদেরকে প্রথমে রেখছিল মহিলা গারদে, কারণ মহিলা আসামি ছিল না। এত নোংরা গারদ, টয়লেটে দরজা নেই। পায়খানা-প্রশ্রাব সব এসে ভরে আছে দরজার সামনে দিয়ে। আমাদের এক ভাই গিয়েছিল থানায়। নাম সোলায়মান। আম্মাজানা ওকে পাঠিয়েছিলেন খানা দিয়ে। ওকে দিয়েই জায়গাটা পরিষ্কার করালাম। হোগলার চাটাই কিনে আনালাম। পাঁচটা চাটাই কিনিয়েছিলাম, তিনটা বিছিয়েছিলাম ফ্লোরে। তারপরে এমামুয্যামানের জন্য থানা থেকে কাঁথা দিল, বালিশ দিল, সাদা একটা চাদর দিল। বিছানা করে দিলাম। বাথরুম থেকে এত গন্ধ আসছিল যে আমরাই থাকতে পারছিলাম না, চিন্তা করছিলাম এমামুয্যামান কীভাবে থাকবেন। দেখা গেল যে মানিয়ে নিতে আমাদের থেকে এমামুয্যামান বেশি পারদর্শী। আমাদের কাছে খারাপ লাগছে কিন্তু এমামুয্যামানের কাছে মনে হয় যেন সবাই স্বাভাবিক। শুরু হল রিমান্ড।

ঐখানে আমরা মোট তের দিন থাকলাম রিমান্ডে। তারপরে এমামুয্যামান মনে হয় নিজেই ঢুকেছিলেন যে তাঁর বাইরে একা একা ভাল লাগে না। রাত্রে এখানেই থাকতাম। প্রচণ্ড গরম। ওরা একটা হাতপাখা দিয়েছিল। রাত্রে আমরা তিনজন দুই ঘণ্টা করে কাজ ভাগ করে নিয়েছিলাম। দুই ঘণ্টা করে আমরা বাতাস দিব। কিন্তু এমামুয্যামান পাখার বাতাস নিবেন না। এমামুয্যামান আলোতে ঘুমাতে পারতেন না। তাই শুলে চোখের উপর সাদা রুমালটা দিয়ে শুতেন যাতে আলো চোখে না লাগে। এমামুয্যামান রুমাল দিয়ে শুয়ে আছেন। আমাদের বললেন, 'এই তোমরা শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো।' আমরাও শুয়ে পড়লাম। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হলে আমরা উঠে আস্তে আস্তে এমামুয্যামানকে বাতাস দিতে থাকি। যখন রুমাল সরান আমরা আবার শুয়ে পড়ি। এমামুয্যামান উঠে দেখেন সব তো শুয়ে আছে। আবার শুয়ে পড়েন এবং চোখে রুমাল দেন। আমরা তিনজনই কিন্তু জেগে আছি। আবার একে অন্যকে খোঁচা দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসি। আবার আরো আস্তে আস্তে বাতাস দেই যাতে গায়ে না লাগে। উপর থেকে খুব আস্তে আস্তে হালকাভাবে। আবারো এমামুয্যামান রুমালে হাত দেন। হাত দেয়ার আগেই আমরা ঘুমিয়ে গেছি এমন ভাব করে থাকি। এমামুয্যামান বললেন, 'বাতাস দেয় কে? বাতাস কোত্থেকে আসে?' তৃতীয়বার এমামুয্যামান আর রুমালে হাত দিলেন না। বললেন, 'তোমাদের না বলেছি শুয়ে পড়তে, বাতাস দিচ্ছ কেন?' তখন আর আমাদের আর বলার আর কিছু ছিল না। বললাম, 'জ্বী এমামুয্যামান শুয়েছি।' তখন এমামুয্যামান বললেন, 'আমাকে আর বাতাস দিতে হবে না। তোমাদের যতটুকু গরম লাগছে আমার তার থেকে কম লাগে। আমাদেরকে বুঝালেন যে তাঁর কষ্ট হচ্ছে না। যাক বাতাস দিতে দিলেন না। এর মধ্যে আগরাবাতি কিনে এনে এমামুয্যামানের জন্য আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা আছে। এরমধ্যে বাথরুমের গন্ধ। কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার করে না, আর ঐখানেই আমাদের সব খাওয়া দাওয়া। (চলবে...)

[লেখক: আব্দুর রকিব, সহকারী বিভাগীয় আমির, রংপুর বিভাগ, হেযবুত তওহীদ]

মাননীয় এমামুয্‌যামানের ড্রাইভিং

খাদিজা খাতুন

এমামুয্‌যামান তরুণ বয়স থেকেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এটা আমরা সবাই জানি। বহু বিষয়ে তাঁর কেবল ঝোঁক নয়, রীতিমতো দক্ষতা ছিল। প্রচণ্ড দুঃসাহসে তিনি জীবনভর একটার পর একটা বিষয় নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন, মেতে থেকেছেন। এতকিছুর মধ্যে জ্ঞানসাধনার অবসর তিনি কখন পেলেন সেটাও আরেক বিস্ময়। তিনি তাঁর দুরন্ত কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবনের ঘটনাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতেন। এমনিতে তিনি নিজের কথা বলতে চাইতেন না কিন্তু নানা প্রসঙ্গে সেগুলো যখন চলে আসত তখন অবাক হয়ে ভাবতাম এই মানুষটা এক জীবনে আর কত কী করেছেন। আজকে তাঁর ড্রাইভিং নিয়ে কিছু স্মৃতিচারণের গল্প বলি।

এমামুয্‌যামান গাড়ি চালানো শিখলেন কীভাবে সেটাই শুরুতে বলি। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, তিনি কারো কাছ থেকেই গাড়ি চালানো শেখেননি। অন্যদের গাড়ি চালানো দেখে দেখে তিনি কীভাবে গাড়ি চালাতে হয় সেটা বুঝে নিয়েছিলেন। একদিন তিনি তাঁর খালার বাড়ি বগুড়ার নওয়াব প্যালেসে বেড়াতে গিয়ে কী মনে করে পট করে একটা গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসলেন! বসেই চেপে দিলেন এক্সেলেটর। গাড়ি ছুটতে আরম্ভ করল। যারা সেখানে ছিল সবাই তো হৈ হৈ করে গাড়ির পিছন পিছন দৌড়াতে শুরু করল। ততক্ষণে এমামুয্‌যামান গাড়ির উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। তিনি খুব সুন্দর করে পুরো বাড়ির চারপাশ ঘুরে এসে জায়গামতো এসে ব্রেক করলেন। এই ছিল এমামুয্‌যামানের প্রথম গাড়ি চালানোর ঘটনা।

পোষা চিতাবাঘ ও প্রিয় ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে তরুণ এমামুয্‌যামান।

পাহাড়ি পথে শিকারের সন্ধানে এমামুয্‌যামান।

এমামুয্‌যামান মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ছিলেন এটা আমরা অনেকেই জানি। এর মানে হল তিনি মোটর সাইকেল চালানোর সময় নানারকম কসরৎ দেখাতে পারতেন। সাইকেলের উপর শুয়ে শুয়ে, দাঁড়িয়ে নানারকম খেলায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সাইকেল চালাতে গিয়ে অনেকবার তিনি দুর্ঘটনার শিকারও হয়েছেন। একটি দুর্ঘটনার কথা তিনি অনেকবার বলেছেন। এমামুয্‌যামানদের পারিবারিক জমিদারির বড় অংশ ছিল বগুড়া এলাকায়। বগুড়াতে তিনি অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন। সেই তরুণ বয়সে এমামুয্‌যামানের ৩০০০ সিসি'র শক্তিশালী মোটর সাইকেল ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে এ জাতীয় সাইকেল ব্যবহৃত হত। তিনি এটি এনেছিলেন ভারত থেকে। বগুড়া শহরের মধ্য দিয়ে একদিন তিনি প্রচণ্ড গতিতে মোটর সাইকেলটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে ছিল রাস্তার লোকজন। কিন্তু হঠাৎ বাধল বিপত্তি। একটি গরু ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলেদুলে চলছিল। মোটর সাইকেলের বিকট শব্দে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। তাকে বাঁচাতে গিয়ে এমামুয্‌যামান মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সাইকেলটি রাস্তার পাশে সজোরে আছড়ে পড়ে। আর এমামুয্‌যামান সাইকেল থেকে ছিটকে শূন্যে উড়ে গিয়ে একটি বাড়ির দেওয়ালের উপরে পড়েন। সেখান থেকে আবার এসে পড়েন রাস্তায়। তারপর রাস্তার উপর দিয়ে অনেকটা জায়গা ছেঁচড়ে গিয়ে তাঁর শার্ট-প্যান্ট ছিঁড়ে যায়, শরীরের অনেক জায়গায় ছিলে যায়। লোকজন ছুটে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে নিকটেই একটা ডিসপেন্সারিতে নিয়ে যায়। তখন ঐ ডাক্তারটা এমামুয্‌যামানের দিকে তাকাতেই বললেন যে,

"একটু আগে তুমি এখান দিয়ে মোটর সাইকেলে করে গিয়েছিলে না? আমি আওয়াজ শুনেছিলাম। তখনি আমি মনে মনে বলছিলাম যে, দেখা যাক এ কতখানি যেতে পারে!" এমামুয্যামানের কিছুই বলার ছিল না। শুধু মোটর সাইকলে নয়, ঘোড়া দৌড়ানোও ছিল এমামুয্যামানের অভ্যাস।

মাঝ নদীতে আটকে গেল জিপ। নামল জোয়ারের ঢল।

এমামুয্যামান মাঝেমাঝেই পুরান ঢাকার বকশি বাজারে থাকতেন। ওখান থেকে ভাই-বোনদের নিয়ে রাত্রে গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে বের হতেন। এয়ারপোর্টের নিকটে তুরাগ নদীর পাড়ে তখনও পাকা রাস্তাটি হয়নি, তা শুধুমাত্র একটি কাঁচা রাস্তা ছিল। একদিন এমামুয্যামান গাড়ি চালাতে চালাতে সেই কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েন এবং ঠিক তখনই গাড়িটা কাদায় আটকে যায়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা রাখতেই বুঝে গেলেন যে, এখান থেকে গাড়ি উঠানো মুশকিল হবে। কেননা পুরো গাড়ি যতদূর নেওয়া যায়, তার সম্পূর্ণ রাস্তাটি শুধু কাদা আর কাদা। আর গাড়িটা ব্যাকগিয়ারে যেতে তো একটু শক্ত মাটি প্রয়োজন। এমামুয্যামান বুঝতে পারলেন এখান থেকে গাড়ি তোলা তাঁর সাধ্যের বাইরে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, "আল্লাহ্ আমি এখন কী করব?" হঠাৎ করে তিনি আকাশে একটা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলেন। তারপর এমামুয্যামান কী মনে করে আবার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসলেন। তারপর ব্যাকগিয়ারে নেওয়ার জন্য এক্সেলেটরে পা দিলেন এবং তখনই তাঁর মনে হলো যেন গাড়ির চাকা পাকা রাস্তার উপর দিয়ে যেভাবে চলে সেভাবেই পিছনে উঠে আসলো।

এমামুয্যামান বেশকিছু নিয়ম মেনে চলতেন। কেউ কেউ এগুলোকে কুসংস্কার বলতে পারে কিন্তু তিনি এগুলো মানতেন। বাঘ-বন-বন্দুক বইয়ে তিনি লিখেছেন শিকারীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, আর জিম করবেটও এর বাইরে ছিলেন না। এমামুয্যামানের একটি অলিখিত নিয়ম ছিল তিনি সোমবার বিকেলে কোথাও বের হতেন না। আমাদেরও নিষেধ ছিলো সোমবার আছর বাদ বের হওয়া। কবে থেকে তিনি এই নিয়ম মেনে চলছেন জানি না, তবে তরুণ বয়সে তিনি একদিন ভুলে গিয়েছিলেন যে সেদিন সোমবার ছিল। তিনি শিকারে বের হলেন জিপ গাড়ি নিয়ে। পাহাড়ী জঙ্গলের মাঝামাঝি একটা নদী। ভাটার সময় চলছে বলে তেমন পানি ছিল না, গাড়ি নিয়ে পার হয়ে যাওয়ার মতো। তিনি যখন মাঝনদীতে ঠিক তক্ষুনি জোয়ারের ঢল নেমে আসল। এমনভাবে জোয়ারের পানিতে নদী ভেসে গেল যে জিপ গাড়িটাও পানিতে আটকে গেল। এমামুয্যামানসহ যাত্রীরা সবাই দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে পাড়ে উঠে গেলেন। গাড়ি পড়ে রইল নদীতে, ভাটার অপেক্ষায়।

আর একটা ঘটনা। তখন গাজীপুর থেকে টাঙ্গাইলের রাস্তাটি হয়নি। টাঙ্গাইল থেকে গাড়ি ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকায় আসত। এমামুয্যামান টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা আসছিলেন। তখন এমামুয্যামানের সাথে অনেক লোকজনও ছিল; কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও ছিলেন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন (ওনার কাজিনরা সম্ভবত) গাড়িতে। গাড়ি চালাতে চালাতে তাঁর ঘুম পাচ্ছে। তিনি অন্যদের উদ্দেশ্যে কয়েকবার বললেন যে, তোমরা কেউ এসে চালাও। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তারা বললো, "না, না, চলতে থাকুক।" তাই ঘুম আসা সত্ত্বেও এমামুয্যামানই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তো চলতে চলতে একটা সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু অন্যরা কেউ সেটা টেরই পেল না। তিনি ঘুমের মধ্যেই গাড়ি চালাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চমকে উঠে ভাবলেন যে- কী ব্যাপার আমি কোথায়? দেখলেন যে গাড়ি চলছে রাস্তা দিয়ে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে গত আধঘণ্টা তিনি ঘুমের মধ্যেই গাড়ি ড্রাইভ করেছেন। এই সময়ে তিনি কী করেছেন কিছুই তাঁর মনে নেই। বিস্মিত এমামুয্যামান অন্যদেরকে বললেন, 'আমি যে আধা ঘণ্টা ঘুমিয়ে ছিলাম তোমরা টের পাও নাই? আমাকে ডাকলে না কেন?' তারা এ কথা শুনে আরো অবাক! একজন বলল, 'একটু আগেই তো তুমি একটি ভাঙা ব্রিজের পাশ দিয়ে নেমে বিকল্প রাস্তায় চালিয়ে মেইন রোডে উঠলে। ঘুমিয়ে থাকলে এটা কী করে সম্ভব?' কতবড় বিপদ থেকে তাঁরা সবাই রক্ষা পেয়েছেন তা উপলব্ধি করে এমামুয্যামান আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। ড্রাইভার যদি এক সেকেন্ডের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে তাহলেও দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সেখানে এত দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ি চালানোর পরও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এমামুয্যামান বলতেন তাঁর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ

স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেছেন। হয়ত এজন্যই যে তাঁকে নিয়ে আল্লাহর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। নাহলে এসব ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

গাড়ি সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা বলে শেষ করছি। ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। একদিন আমি এমামুয্‌যামানের বাংলা মোটরের চেম্বারে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কাজ শেষে মালিবাগে আমি আমাদের বাসায় যাব। আমাকে নামিয়ে দিয়ে এমামুয্‌যামান যাবেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে। মগবাজারের মোড়টাতেই এমামুয্‌যামান আমাকে নামিয়ে দিলেন। ঠিক তখনই গাড়িটা একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। এমামুয্‌যামান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দুই হাত দিয়ে জঞ৪০ গাড়িটি উঁচু করে গর্ত থেকে তার চাকাটি উঠিয়ে আনলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম। মাশাল্লাহ! ভাবা যায় তেয়াত্তর বছর বয়সেও এমামুয্‌যামান গায়ে কতটা শক্তি রাখতেন।

একজন মহান মানুষের দর্শনলাভ

সুলতানা রাজিয়া হেলেন

প্রকাশনা বালাগে সারাদেশের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করায় লেখিকার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

যখনই পৃথিবীতে কোনো মহামানবের আগমন ঘটেছে তখন তার ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাধুর্যে তার জাতি, উম্মাহ, অনুসারীরা অভিভূত হয়েছে। তাকে অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে, প্রাণভরে ভালোবেসেছে। মানুষের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা তো আর এমনি এমনি আসে না -এজন্য মানুষকে বিশেষ কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হয়। হেযবুত তওহীদের মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম তেমনই একজন ব্যক্তি, একজন মহামানব।

যখন কেউ মহান কার্য সম্পাদন করেন, যখন কেউ দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, জাতির জন্য, মানবজাতির জন্য নিজের জীবনকে, নিজের সম্পদকে উৎসর্গ করে যান তখন তাঁর এই কর্মকে আমরা মহান কর্ম হিসাবে গণ্য করতে পারি এবং সেই মানুষটিকে আমরা মহামানব গণ্য করতে পারি। মহামানব বলতে বোঝায় মহান যে মানব। মাননীয় এমাম উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষ আজ বাইরে থেকে যতই

সভ্যতার বড়াই করুক আসলে ভেতরে সে চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত। প্রতিটি জনপদ আজ অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এখন মানুষকে যদি ন্যায়, সুবিচার, শান্তির মধ্যে আনতে হয় তবে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, নিজের জীবন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছেন, চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন, জেল খেটেছেন, তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তবু তিনি এক মুহূর্তের জন্য থেমে না গিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চরম সাহসী, সত্যবাদী, আমানতদার, নিরহংকার, অতিথি পরায়ণ, মানুষের জন্য মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ একজন মহান মানুষ। এসমস্ত কারণে আমরা তাঁকে মহামানব বলি।

যাইহোক, তিনি এমন একজন নেতা যার গতিশীল নেতৃত্বে, সাহসী পদক্ষেপে, বলিষ্ঠ বক্তব্যে, যথাযথ সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্র গতিতে এই আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দায়িত্বের প্রতি তাঁর অবিচলতা প্রত্যক্ষ করে আমি অভিভূত। আমি সৌভাগ্যবান যে কাছ থেকে মাননীয় এমামকে দেখার, জানার সুযোগ পেয়েছি। তিনি অসার কোনো কথা বলেন না, কাউকে অসম্মান করে কথা বলেন না। প্রকৃত ইসলামের যুগের নেতারা কেমন ছিলেন তা ইতিহাস পড়ে যেটুকু জেনেছি তাতে মাননীয় এমামের মাঝে সেই নেতাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তাঁর মাথার উপর রাজ্যের চাপ কিন্তু তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখিনি, কখনো হতাশ হতে দেখিনি- সর্বদা বজ্রের মতো দুর্দান্ত গতিতে তিনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন, এগিয়ে চলেছে হেযবুত তওহীদ। তাঁর নিজের বলে কোনো সময় নেই, পুরোটা সময় তিনি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, মানবজাতির জন্য একটা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গঠনের প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত থাকেন আন্দোলনের কাজ নিয়ে। আমি আগে এটা ভেবে কষ্ট পেতাম যে, কেন প্রকৃত ইসলামের যুগে জন্ম নিলাম না, কেন মুসলিম জাতির সেই স্বর্ণযুগে, সেই ইস্পাত-কঠিন ঐক্যের যুগে জন্মগ্রহণ না করে জাতির এমন বিশৃঙ্খল, বহু দলে বিভক্ত, দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত এই মুসলিম জাতির মাঝে জন্ম নিলাম! মাননীয় এমামের দর্শন পাবার পর আমার সেই ইচ্ছেটা চলে গেছে। কারণ আমার মাঝে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, অতি অচীরেই মাননীয় এমামের নেতৃত্বে এই মুসলিম জাতি আবার ইস্পাত-কঠিন ঐক্যবদ্ধ হবে, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলে এক কালেমার ছায়াতলে আসবে এবং স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ। ক'জনের এমন সৌভাগ্য হয়।

মাননীয় এমামের প্রত্যেকটা মানবিক গুণাবলী ও নেতৃত্বের যোগ্যতা আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে নানা রকম সঙ্কটময় পরিস্থিতে, হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া কোনো বিপর্যয়কর মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার যে প্রজ্ঞা তা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হই, এটা দেখে আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় যে, তিনি আল্লাহর মনোনীত এমাম।

২০২০ সালে হেযবুত তওহীদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তীর আয়োজন করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক, লাখ-লাখ মানুষ দূরদূরান্ত থেকে জমায়েত হওয়া শুরু করেছে রাজধানী ঢাকায়, সবার জন্য খাবারের আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু এই প্রস্তুতি দেখে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটির গাত্রদাহ শুরু হয়, তারা প্রোগ্রামের আগের দিন রাত থেকেই ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে, ঐ দিন ফজরের নামাজের পরেই শুরু করে উত্তরার বিভিন্ন রাস্তা অবরোধ, মিছিল, সমাবেশ। উত্তরা জোনের ডিসি মাননীয় এমামকে ফোন করে বললেন- "যেহেতু আমরা সকল প্রকার অনুমোদন দিয়েছি, কাজেই আপনি চাইলে অনুষ্ঠান করতে পারেন, তবে নিরাপত্তার চিন্তা করলে অনুষ্ঠান না করাই ভালো।"

এ অবস্থায় মাননীয় এমামের সামনে দু'টো পথ খোলা রইল। এক- অনুষ্ঠান স্থগিত করা, দুই- ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। নিঃসন্দেহে সংঘর্ষ লাগলে উভয়পক্ষের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ফেলার পরে এই অনুষ্ঠান স্থগিত করাটাও ছিল কঠিন এক সিদ্ধান্ত। কিন্তু নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে ভেবে এমাম প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। সদস্যদের কোটি কোটি টাকাসহ হাজার হাজার সদস্যের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় সেদিন। মাননীয় এমামকে সেই পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়তে দেখিনি। এমন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর উপর রাজি-খুশি থেকে অবিচল থাকতে পারেন ক'জন!

২০১৬ সালের ১৪ ই মার্চ ধর্মব্যবসায়ী একটা গোষ্ঠী মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে, গুজব রটিয়ে মাননীয় এমামের বাড়িতে হামলা চালায়। সেখানে মাননীয় এমামের বাড়ির প্রাঙ্গণে নির্মাণাধীন মসজিদকে গীর্জা এবং হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে খ্রিষ্টান বলে

অপপ্রচার চালিয়ে বহু সাধারণ মানুষকেও প্ররোচিত করা হয় এই ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে। মসজিদটিকে গুড়িয়ে দেয়া হয়, মাননীয় এমামের বাড়িতে লুটপাট করে আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়, ঘেরের মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। মাননীয় এমামের বাবা-মা, চার ভাই ও ভাইদের পরিবারসহ হেযবুত তওহীদের শতাধিক সদস্যকে ধর্মব্যবসায়ী ঐ শ্রেণিটি সেদিন হত্যা করতে চেয়েছিল। দুইজন সদস্যকে তারা হাত-পায়ের রগ কেটে জবাই করে হত্যা করে, এরপর পুড়িয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতেও মাননীয় এমাম অবিচল ছিলেন, ভেঙে পড়েন নি।

তখনও তিনি হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে সাধ্যমতো প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার নির্দেশ দেন। কোনোভাবেই প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে কাউকে যেন হত্যা করা না হয় সে ব্যাপারে তাগিদ দেন। সদস্যরাও মাননীয় এমামের এই নির্দেশ পালন করেন অক্ষরে অক্ষরে। জীবন দিয়েছেন কিন্তু আন্দোলনের নীতির বাইরে যান নি। সেদিন যদি এই নীতি ভঙ্গ করা হতো তাহলে সকল মহল থেকে আন্দোলনের উপর অপবাদ দেওয়া হতো।

এই পরিস্থিতিতে একটা মানুষের পক্ষে স্থির থাকা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু তিনি তা-ই ছিলেন। মাননীয় এমামের চারিত্রিক উৎকর্ষের এমন শতশত উদাহরণ আছে যা লিখে শেষ করা যাবে না। তাঁর এই গুণাবলীতে অভিভূত হয়ে এখন হাজার-হাজার মানুষ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে, মানুষ সত্য জানতে পারছে।

মাননীয় এমামকে দেখলেই শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে। আমার সাথে দেখা হলেই হাসিমুখে জানতে চান, কেমন আছি- খোঁজ খবর নেন। এ থেকেই বুঝতে পারি তিনি একজন সাধারণ সদস্যকেও কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমানে যারা বিভিন্ন দলের বড় বড় নেতার আসনে বসে আছেন তাদের কাছে যাবার সুযোগ সাধারণ মানুষের খুব একটা হয় না। তারা তাদের নেতার কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ, তাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলার সুযোগ পায় না। কিন্তু মাননীয় এমাম সবাইকে নিয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করেন, সবার খোঁজ-খবর নেন, বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের মতামত গ্রহণ করে থাকেন। প্রকৃত নেতা তো তিনিই যিনি সুখে-দুঃখে সব পরিস্থিতিতে তার অনুসারীদের পাশে থাকেন। আমি ধন্য এমন একজন নেতা পেয়ে। আমি মাননীয় এমামের সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি, সাথে তিনি যে মহান দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাতে যেন তিনি সফলকাম হন সেই কামনাও করি।

তারেকুয্‌যামান সানিঃ অকালে ঝরল যে নক্ষত্র

ডা. জাকারিয়া হাবিব

তারেকুয্‌যামান সানি

• জন্ম ও শৈশবঃ

৮ মে, ১৯৯৬ সাল। রাজধানীর হাজারীবাগে ছোট্ট একটি ভাড়া বাসায় মো. হারুন অর রশীদের সংসারে জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি সন্তান। সুন্দর এই ছেলের মুখটি দেখে বড় ভাই হাসানুয্‌যামান রনির নামের সাথে মিল রেখে বাবা নাম রাখলেন তারেকুযাযামান সানি। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান সানি ছিল সবচেয়ে আদরের, যে কেউ দেখলেই ওকে কোলে নিতে চাইতো। চেহারায় মায়া আর দুধে আলতা রঙে ও ছিল অনন্য সাধারণ। সবচেয়ে অসাধারণ বিষয় ছিল, ছোটবেলা থেকেই এতটাই শান্ত স্বভাবের ছিল যে, বোঝাই যেত না ঘরে একটি শিশু আছে। গাড়ির প্রতি ছিল তার অসম্ভব দুর্বলতা। গাড়ির হর্ণ শুনলেই তাকে রাস্তায় নিয়ে যেতে হতো গাড়ি দেখানোর জন্য।

এক বিবাহ অনুষ্ঠানে মাননীয় এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের সাথে করমর্দন করছেন তারেকুয্যামান সানি।

• শিক্ষা জীবন:

স্কুল জীবনের শুরুতেই সানি তার মেধার পরিচয় দেয়। ছোটবেলাতেই তার বাবা-মাকে কখনোই তাকে পড়ার জন্য জোর দিতে হয়নি। বাসায় তাকে পরিবারের কেউই কখনোই ঘণ্টা খানেকের বেশি পড়তে দেখেনি। কিন্তু ক্লাসে সবসময় ওর রোল থাকতো এক-দুইয়ের মধ্যে। তার এই মেধার কারণে স্কুলের সমস্ত শিক্ষকের খুব প্রিয় ছিল সে। একবার ঢাকার গভ: ল্যাবরেটরী স্কুলের একজন গণিত শিক্ষক তার মাকে বলেছিল "আমার ১৭ বছরের শিক্ষকতা জীবনে সানির মতো মেধাবী ছাত্র আর দ্বিতীয়টি পাইনি।" সানি ২০১২ সালে দেশসেরা বিদ্যাপীঠ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মাদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে বেশ পছন্দ করতো সে। কোন জিনিস একবার দেখেই এঁকে ফেলতো সে। কার্টুন দেখতে খুবই ভালবাসতো আর শুধু দেখতোই না কার্টুনের ছবিও আঁকতো হুবহু। ছবি আঁকায় শিশু একাডেমি, নতুনকুঁড়ি, শেখ রাসেল শিশু সংঘ, কচিকাচারর মেলাসহ দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গণ থেকে পুরস্কার পেয়েছিল সে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে শেখ রাসেল শিশু সংঘের আয়োজনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে সানি।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মাদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। শুধু তাই নয় সেবার ঢাকা বোর্ডেও সর্বোচ্চ মেধা তালিকায় ২০ জনের মধ্যে স্ট্যান্ড থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। কলেজ থেকে দেওয়া হয় গোল্ড মেডেল। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছিল সানি। তবে পছন্দের প্রথম তালিকায় থাকা দেশসেরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কেই বেছে নেয় সে। বুয়েটের স্থাপত্যবিদ্যায় ভর্তির সুযোগ পেয়ে আরও একধাপ এগিয়ে যায় সানি। পরিবারের আশা আরও বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে এই বিষয়ে পড়ালেখার খরচ অনেক গুণ বেশি। সময়ও একবছর বেশি লাগে। তবে নিজ যোগ্যতায় টিউশনির টাকা দিয়েই নিজের পড়ালেখার বেশিরভাগ খরচ চালাতো। কখনোই পরিবারের উপর চাপ পড়তে দেয় নি। বরং টিউশনির টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলতো, 'মা তোমার যেটা পছন্দ সেটা কিনবে'। ছাত্রাবস্থায়ই অনেক শিক্ষক ও প্রফেশনালদের সাথে সহকারী হিসেবে কাজের সুযোগও পায়। নিজে সবসময় ভালো জিনিস ব্যবহার করতো। তার পছন্দের মোটরসাইকেলটিও প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিল।

• আন্দোলনে সানি:

বুয়েটে পড়া অবস্থাতেই সানি আল্লাহর অশেষ কৃপায় তার বড় ভাই হাসানুয্যামান রনি ও আমার মাধ্যমে বালাগ পেয়ে হেযবুত তওহীদে যোগদান করে। নিজ চেষ্টা আর যোগ্যতায় কিছুদিনের মধ্যেই মাননীয় এমামের নজর কাড়ে সে। মাননীয় এমাম তাকে ডেকে বিভিন্ন সময় কাজ দিতেন। প্রথম কাজটি দেন দাজ্জাল নামে একটি অ্যাপ বানানোর জন্য। অ্যাপটি তৈরির জন্য সানি অ্যাপ বানানোর কোর্সে ভর্তি হয়। এটি করতে গিয়ে তার একটি সেমিস্টারও লস হয়। কিন্তু বাসায় বা

কারও কাছে কখনোই এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেনি। সর্বশেষ মাননীয় এমাম নোয়াখালী উন্নয়ন প্রজেক্টের বেশকিছু স্থাপত্য কাজ সানিকে দেয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকবারই সানি নোয়াখালীতে পরিদর্শন করতো। তবে কাজগুলো হয়তো সমাপ্ত করতে পারেনি সে।

কণ্ঠশিল্পী নাজমুল আলম শান্তর সাথে তারেকুয্যামান সানি

• আন্দোলনের ভাই-বোনদের সাথে সানি:

ছোটবেলা থেকেই সানি ছিল নিঅহংকারী। এজন্য ওর বন্ধুর সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু আন্দোলনের ভাই-বোনদের সাথে মিশতো আপনজনের মতো। সর্বদাই হাসি দিয়ে কথা বলতো। কে কি করতো সেটা সে কখনোই ভাবতো না। হকার, রিক্সাচালক, ব্যবসায়ী সবার সাথেই সে বন্ধুসুলভ আচরণ করতো। বাসায় নিয়ে যেত। মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খাওয়াতো।

অনলাইন কথনে বছরখানেক আগে একটি পোস্ট করেছিল সে, কোন ভাই-বোনের সন্তানদের পড়ালেখার বিষয়ে কোন সাহায্য লাগলে সানি দিতে প্রস্তুত। আন্দোলনের বেশ কয়েকজন ভাইও সানির কাছে পড়তো। সানির মন্ত্রমুগ্ধ পড়ানোতে তারা সানির ভক্ত হয়ে যেত। বিভিন্ন সময় ইনকামের সুযোগ পেলে সানি চেষ্টা করতো সেটার সুযোগ ভাই-বোনদের দিতে। বুয়েটের ছাত্র পরিচয়ে বিভিন্ন স্কুলে ম্যাপ ও অন্যান্য প্রকাশনা বিক্রির ব্যবস্থা করে দিত।

প্রায় প্রতিদিন সকালে মাঠে শরীরচর্চার জন্য যেত সানি। কিন্তু আমরা অনেকেই যেতে পারতাম না। একদিন আক্ষেপ করে বলেছিল, 'আমরা সামান্য ঘুমটাই বিসর্জন দিতে পারিনা, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় জীবনটা কীভাবে দিব?'

• আন্দোলনে ফান্ড:

সানির হাতখোলা স্বভাব ছিল। কখনোই তাকে কৃপণতা করতে দেখা যায়নি। আন্দোলনে নিয়মিত ফান্ড দিত সে। চেষ্টা করতো ভালো পরিমাণে ফান্ড দেওয়ার। একবার সে তার আমিরের হাতে ১৯ হাজার টাকা দিলে বললো আমির টিউশনির টাকা পেলাম ফান্ডে দিয়েন।

• বালাগ:

প্রাথমিক অবস্থায় সানি পত্রিকা বিক্রি, প্রজেক্টর প্রোগ্রাম, প্রকাশনা বালাগে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। কখনোই সে পড়ার বা ক্লাসের অজুহাত দিত না। সে যদি বাসায় থাকতো তাহলে সাথে সাথে আমির ডাকা মাত্রই চলে যেত। আর যদি বুয়েটে থাকতো তাহলে এসে আগে আমিরের সাথে দেখা করতো। মাঝে মাঝে মোটরসাইকেল দিয়ে মিডিয়া বালাগ, থানায় পত্রিকা দেয়া, বাসাবো থেকে পত্রিকা আনার কাজ নিয়মিত করতো।

যেখানেই যেতো বালাগ করতো। সবধরনের মানুষকে বালাগ দেওয়ার চেষ্টা করতো। ওর স্থানীয় বন্ধুরা বলতো, সানি যদি দশটা কথা বলে তাহলে এর মধ্যে তিনটা কথাই থাকতো হেযবুত তওহীদের। এজন্য অনেকেই বিরক্ত হয়ে যেত।

• পরিবারের সাথে সানি:

সানি তার মাকে অনেক ভালবাসতো। মাও সানিকে ছাড়া কিছুই বুঝতো না। আদর করে সানিকে বাজান বলে ডাকতো। প্রায় দুই বছর আন্দোলন বোঝানোর পর তার মা হেযবুত তওহীদে যোগদান করেছিল। বাহির থেকে আসলেই আগে মায়ের সাথে দেখা করতো। জড়িয়ে ধরে বলতো, মা তোমার গন্ধ না শুঁকলে ভালোই লাগেনা।

বাসায় থাকা অবস্থায়ও সানি অনেক কম কথা বলতো, কাউকে ডিস্টার্ব করতো না। খাবার খেতো অনেক কম। নিজের মতো করে থাকতো। সাদামাটা চালচলন, সাধারণ পোশাক পড়তো। তবে কারও প্রয়োজনে চেষ্টা করতো সাহায্য করতে। পরিবারের ছোটদের অনেক স্নেহ করতো। একসাথে কার্টুন দেখতো, ছবি দেখতো। ছোটরাও সানিকে অনেক ভালোবাসত। খালাদেরকে মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে বলতো খালামনি খরচ করবেন। সানির জীবদ্দশায় পরিবারের কারও সাথে কখনও ঝগড়া-মারামারি কোন কিছুই হয়নি।

• মৃত্যু:

১৪ জুলাই, ২০২২। দুপুর দুইটায় বাসায় কাউকে কিছু না জানিয়েই বের হয় সানি। বের হওয়ার পরই সানির সাথে দেখা রিপন নামের আন্দোলনের এক ভাইয়ের সাথে। তাকে সানি জানায় সে মৈনট ঘাটে বেড়াতে যাচ্ছে সঙ্গে যাবে কিনা। রিপন ভাইয়ের কাজ থাকায় রিপন ভাই সাথে যেতে পারেনা। সানি তার বাড়িওয়ালার ছেলেসহ স্থানীয় ১৫ জনের সাথে নিজের বাইক দিয়েই রওয়ানা হয়। রাত সাড়ে নয়টায় সানির মাকে বাড়িওয়ালার ম্যানেজার জানায় সানিকে পাওয়া যাচ্ছেনা। তারা সবাই মৈনট ঘাটে ছিল। সানি হঠাৎ করেই নাকি পানিতে পড়ে গেছে। শুনেই সানির মা

ঢাকা আজিমপুর গোরস্থানে তারেকুয্যামান সানির জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পড়ান হেযবুত তওহীদের ঢাকা মহানগরীর আমির ডা. মাহবুব আলম মাহফুজ।

সানিকে ফোন করে। কিন্তু ফোন বন্ধ পায়। সানির মা প্রায় জ্ঞান হারানো অবস্থায় সানির খালা এবং খালুদের ফোন দেয়। সাথে সাথেই তারা মৈনট ঘাটে যায়। উপস্থিত বাড়িওয়ালার ছেলে সানির পরিবারকে জানায় সানি সেল্ফি তুলতে গিয়ে পানিতে পরে যায়। কিন্তু তারা যে জায়গাটি দেখায় সেখানে কোমর সমান পানি। একজন মানুষ এই পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা। রাত ১২ টায়ও উদ্ধার কাজ শুরু হয়নি। রাত সাড়ে বারোটায় ফায়ার সার্ভিস এর পুলিশ ও ডুবুরি দল আসে। তারা উদ্ধারকাজ শুরু করে। কিন্তু দেড়টায় আবার উঠে যায়। সানিকে পাওয়া যায়না। ওদিকে পুলিশ ১৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। একেকজন একেক ধরনের তথ্য দেওয়ার কারণে পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ তাদের আটক করে। পরদিন সকাল ৯টায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল পুনরায় উদ্ধারকাজ চালায়। অবশেষে সকাল ১১:২০ মিনিটে সানির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অবাক করা বিষয় মানুষ পানিতে ডুবলে পানি খেয়ে শরীর ফুলে যায়, কিন্তু ১৬ ঘণ্টা পরেও সানির শরীর ছিল সাধারণ। ওর শরীর সাদা ফ্যাকাসে হওয়ার পরিবর্তে উজ্জল লাল হয়ে গিয়েছিল। লাশ উঠানোর ১০ মিনিটের মাথায় সানির নাক ও মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত পরতে থাকে। এরপর সানির মরদেহ পুলিশ নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। সানির মা ও পরিবার পুলিশকে অনুরোধ করে সানির লাশটি দিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা কোনো মামলা করবেনা। তবুও যেন তারা দিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশ আইনের কারণে অপারগতা প্রকাশ করে। সানির পোস্টমর্টেম হয়। দোহার থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে ওই ১৫ জনের বিরুদ্ধে। মামলায় সানির বড় ভাই মো. হাসানুয্যামানকে বাদী করা হয়। ১৫ জুলাই ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সানিকে সমাহিত করা হয়। এসময় আন্দোলনের আমির, মোজাহেদ, সানির স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু আত্মীয় স্বজনরা উপস্থিত ছিল। সবার মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, ১৫ জন উপস্থিত থাকতে একজন মানুষ কীভাবে কোমর সমান পানিতে পড়ে মারা যায়।

ঘটনার পর থেকেই সানির শোক সন্তোপ্ত পরিবারকে আসামিপক্ষের থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। সানির মায়ের দাবি, ওরা যদি নির্দোষ হয় তাহলে আপনারা এত অস্থির হচ্ছেন কেন। আদালতই ওদের মুক্তি দিয়ে দিবে। আর যদি কেউ দোষী হয় সেও শাস্তি পাবে।

সানির এই মৃত্যুতে রাষ্ট্র একজন ইঞ্জিনিয়ার হারালো, তার পরিবার হারালো তাদের সবচেয়ে আদরের স্বপ্নকে, আন্দোলন হারালো একটি অমূল্য সম্পদকে। সানির মৃত্যুর খবর শুনে মাননীয় এমাম আকস্মিকভাবেই হতবাক হয়ে যান। মাননীয় এমাম অনেক ব্যথিত হন। কোনো হিসাবই মিলাতে পারছিলেন না। সানির তো ওদের সাথে যাওয়ার কথা ছিলনা। সানির মৃত্যুর পর থেকে এখনও তার মা স্বাভাবিক হতে পারেনি, তার খাওয়া-ঘুম অনিয়মিত হয়ে গেছে। সানির পরিবার আন্দোলনের সকল ভাই-বোনদের কাছে সানি ও তার পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

অস্তিত্ব রক্ষার ব্যর্থ সংগ্রামরত ‘মান্দাই সম্প্রদায়’! (শেষ পর্ব)

শামীমা আক্তার

একটি মান্দাই পরিবার।

শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যে বিষয়টি যুক্ত তা হলো নিজস্ব ভাষা। আদিম অবস্থায় প্রত্যেক গোষ্ঠীরই তা যতই ছোট হোক না কেন, নিজস্ব ভাষা বা উপভাষা ছিল। মান্দাইদের মৌখিক ভাষারীতি থাকলেও তার জন্য কোনো লিখিত বর্ণমালা নেই। ‘ঠাঢ়’ ভাষা নামে পরিচিত ভাষার দৈনন্দিন প্রয়োগে তারা উৎসাহী নয়। কেননা তাতে করে প্রতিবেশি বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগে এবং সামাজিক বিনিময়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় বলে তারা মনে করে। এদের ভাষার শব্দ ভোট-বর্মী গোত্রভুক্ত চিহ্নিত হলেও তা ব্যাপক গবেষণা সাপেক্ষ।

এককালে মান্দাইদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিপত্তি ছিলো। তখন সংখ্যায়ও তারা ছিল অধিক। ১৯৪৬ সাল থেকে সমকাল পর্যন্ত সময় সীমায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহুসংখ্যক মান্দাই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। উচ্ছেদ ও সামাজিক পীড়নে বিতাড়িত হয় মান্দাইরা। বর্তমানে যে স্বল্প সংখ্যক মান্দাই ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় বসবাস করছে তারা চূড়ান্ত অবক্ষয়ের শিকার।

এমামমুয্যামান বলেন যখন সমতল এলাকার লোক সংখ্যার চাপ শুরু হয় তখন লোকসংখ্যা বেড়ে গেলও সেই অনুপাতে জমি বাড়ে নি, ফলে ক্রমশ লোকজন পাহাড়-বনে উঠে বন সাফ্ করে বসতি আর ক্ষেত-খামার করতে শুরু করে। তখন বাঙালি এসকল নতুন আবাদীরা সৎ-অসৎ সবরকম উপায়ে আস্তে আস্তে এইসব মান্দাইদের জমিজমা দখল করতে শুরু করে। কিন্তু বুনো জাতি মান্দারা অত্যন্ত সরল হওয়ায় এদের ঠকাতে নবাগতদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এমনি করে অনেক অবস্থাপন্ন বর্ধিষ্ণু মান্দাই একবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তখনকার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আইন করতে হয় যে কোন মান্দাইয়ের সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর হতে পারবে না। নবাগতদের মধ্যে বেশীই ছিল মুসলিম চাষী, তাই এটা আমাদের পক্ষে ঠিক খুশির কারণ নয়।

বর্তমানে মান্দাইদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। স্বল্পজমি, স্বল্পপুঁজি, ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিবিধ প্রভাব মান্দাইদের স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তিকে ব্যাহত করেছে বলেই তারা আজ অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার। সেই সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি মান্দাইদের তুলনায় গতিশীল হওয়ায় কালক্রমে বাঙালিরাই হয়ে উঠেছে এদের শোষক সম্প্রদায়। পৌরাণিক পরশুরামের স্থান দখল করেছে প্রতিবেশী বাঙালিরাই। বাঙালিদের দ্বারা ভূমি দখল, উচ্ছেদ এবং প্রতারণার শিকার হয়েছে মান্দাইগণ। বাঙালিরা যেভাবে পেরেছে এই মান্দাইদের অধিকার-বঞ্চিত করেছে। মান্দাইরা বংশপরম্পরায় যে ভূমিতে বাস করত এবং যেসব জমিতে আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত তার অধিকাংশই চতুর বাঙালিরা জবরদখল করে নিজেদের করায়ত্ব করেছে। ফলে মান্দাইরা অধিকাংশই আজ বাস্তুচ্যুত। অথচ সহজ সরল মান্দাইরা নির্বিকারে সব মেনে নিয়েছে।

আধুনিককালে শিকার যুগের সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে পৃথিবী বহুদূর এগুলেও মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সেভাবে এগোয়নি। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিকাশ সাধিত না হওয়ায় শ্রমবিভাজনও ঘটেনি সেভাবে। আর তাই দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিভাজনের সুস্পষ্ট ভাগ গড়ে না ওঠাতে এদের মধ্যে পৃথকভাবে বিজ্ঞান বা শিল্পচর্চার ধারাও সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশগুলোর চরম সীমায় নতুন শ্রম বিভাজন ঘটে। এই নববিভাজিত অংশ দৈহিক শ্রম থেকে এড়িয়ে মানসিক শ্রম বিভাজনে নিজেদের নিয়োজিত করে। কালক্রমে এরাই উৎপাদনের উপকরণগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য শাসক শ্রেণির সহায়ক শক্তি হিসেবে শুরু করে বিজ্ঞানচর্চা। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রযুক্তিক জ্ঞান অর্জন না হলে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব। এ কারণেই মান্দাইগণ পর্যুদস্ত, অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

আজ অবস্থা এমন হয়েছে যে নিজের জমিতে নিজেরাই মজুরি খাটে এরা। অধিকাংশেরই নিজের কোনো জমি নেই। অনেকের নেই বাস্তুভিটাও। আর তাদের নিজের যে ভাষা ‘ঠাঢ়’ ভাষা তারও কোনো লিখিত রূপ নেই। এ কারণে মান্দাই নৃ-গোষ্ঠী মূলত ধর্মগ্রন্থহীন। গবেষকের

মতে, এই ধর্মহীনতাই এদের অবলুপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ। বস্তুত এ নৃ-গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত মানুষের বস্তুগত ব্যবহার্য উপাদান ও অবস্তুগত বৌদ্ধিক উপাদানের বৃহদংশ এখন প্রায় অন্তর্হিত। তবু তাদের জীবনধারা ও ঐতিহ্য অবলম্বন করেই এ নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও এর অবক্ষয়ের কারণসমূহকে চিহ্নিত করা যায় বলে আমাদের ধারণা।

মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর পৃথক কোনো শিল্পরীতি গড়ে না উঠার মূল কারণ তাদের স্থবির অর্থনৈতিক কাঠামোই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মান্দাই সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর দাঁড়ানো এবং অধিকাংশ কৃষকই ভূমিহীন। নিজস্ব এক টুকরো জমি কিংবা কোনো বাঙালির জমি বর্গা চাষ করে যা ফসল ফলে- তাই মান্দাই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। এতে যে আয় হয় তাদের সংসার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে মান্দাইদের অবস্থারও উন্নতি ঘটে না। আর সে কারণেই এ জনগোষ্ঠীর লোকজন দৈহিক শ্রমজনিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মজুরি খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে শ্রম জীবনের অন্য কানো চিন্তা কখনো তাদের আচ্ছন্ন করে না। কাম ও শ্রমে আত্মোৎসর্গ করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

তবে মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর জীবনের চিরকালের অবিনশ্বর প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গল্প, কাহিনি যা সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে বংশানুক্রমে কথিত হয়ে লোকগাথায় রূপান্তরিত হয়েছে। কখনো তা আশ্রয় করেছে সঙ্গীতে। মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত কিছু সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাতে আরণ্যক ও কৃষিজীবী মান্দাইদের জীবনাচরণের মূল সুরটি ধৃত রয়েছে। বর্ণমালাহীন মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর মৌখিক রীতিতে রচিত এসকল গানে রূপকের আড়ালে স্থান-কাল-পাত্র-কাহিনি-মুহূর্ত-ঘটনা-বিষয়বস্তু ও দৃশ্য পরম্পরার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বর্তমানে তারা কেবল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে। এমতাবস্থায় স্বতন্ত্র কোনো শিল্পের উদ্ভব ঘটাতে পারে নি। যে অরণ্যের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেই অরণ্যও এখন চষা ভূমি। ফলে জীবনযাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনে মানস বিকাশের নিয়মে গান, কবিতা, গল্প নাটক নিজস্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে নি। মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধানের সময় দেখা গেছে যেমন তারা খ্রিস্টান হচ্ছে বেঁচে থাকার তাগিদে, তেমনি কোনো স্থানে বৈষ্ণব ধর্মেও দীক্ষিত হতে দেখা যায়। এখন তারা প্রায় বিলুপ্ত, একথাও বোধহয় সঠিক নয় অন্তত তাদের ক্ষেত্রে। এমন প্রায় নিশ্চিহ্ন মানবগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণা কেবল এ তথ্যই প্রদান করতে পারে যে, মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর, পুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, উপকথা, রূপকথার যে অবশেষটুকু রয়েছে তার মধ্যেই তাদের জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। তার পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুসন্ধান আজ কেবলই হতাশ করে।

বাংলাদেশের জাতিগত ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে অবশ্যই মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই এদের ভাষা, কৃষ্টি-কালচার, অধিকার রক্ষায় সকলকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং সচেষ্ট হতে হবে। মান্দাইদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই হয়তো এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীটির অবলুপ্তি ঠেকানো সম্ভব হবে। মান্দাইদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক থাকার পরও তাদের শিশুরা লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ মান্দাই জনগোষ্ঠীর লোকজন এতোই দরিদ্র যে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য সামান্য সামর্থ্যটুকু তাদের নেই। আজ ওরা নিজেদের সামর্থ্য হারিয়েছে, স্বকীয়তা হারিয়েছে। যেখানে অন্যান্য আদিবাসীরা আজকে নিজেদের পরিচয় গৌরবের সাথে দিচ্ছে- তখন মান্দাইরা হারিয়ে যাচ্ছে হীনম্মন্যতায়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে, সংখ্যালঘু নিপীড়নে। এটা তাদের অস্তিত্বের, সেই সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের চরম বিলুপ্তির লক্ষণ। একটি জাতির ইতিহাসের জন্য যা মোটেও কাম্য নয়। কাজেই, এদের অধিকার, ভাষা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। সরকারের পাশাপাশি জনসাধারণকেও সচেতন হতে হবে এবং তাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

বৈকালী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট

মালিক: মো: আবু হানিফ

মোবাইল নাম্বার: ০১৯২৬-৮৯৬৯১৩

স্থান: রুয়েট গেইট, তালাইমারী, রাজশাহী।

এখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয়।

স ং বা দ পা তা

দুর্ঘটনায় মাননীয় এমামের গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে গুড়িয়ে যায়।

সোনারগাঁয়ে সপরিবারে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার মাননীয় এমাম

নোয়াখালী থেকে সপরিবারে ঢাকা ফেরার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার মুখোমুখী হয় মাননীয় এমাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে বহন করে আনা মাইক্রোবাস। ২০ জুলাই রাত সোয়া দশটার দিকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার অন্তর্ভুক্ত মদনপুর এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে মাননীয় এমাম, এমামের স্ত্রী রুফায়দাহ পন্নী, সুলতানা রাজিয়া, পুত্র সাইফান হানজালাসহ মোট আটজন ছিলেন। দুর্ঘটনায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আল্লাহর রহমে আরোহীদের কেউ আহত হননি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে মাননীয় এমাম নোয়াখালীর নিজ বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। ঈদ পরবর্তী ঢাকামুখী যানজটের কারণে রাস্তায় বেশ দেরি হয়। বিশেষ করে মেঘনা সেতু পার হওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। দুটো বাইকে নিরাপত্তা টিমের মোট চারজন সদস্য মাননীয় এমামের গাড়ির সঙ্গে ছিলেন। মাননীয় এমামের গাড়িটি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলছিল। গাড়ি চালাচ্ছিলেন প্রিন্স মাহমুদ। মদনপুর এলাকা অতিক্রম করে খানিকটা আসার পর হঠাৎ তার সামনের একটি পিক আপ ভ্যান হার্ড ব্রেক করে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সও হার্ডব্রেক করেন। কিন্তু সামনের ভ্যানের সঙ্গে দূরত্ব কম হওয়ায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং মাইক্রোবাসের সামনের অংশ ভেঙে যায়। এক মুহূর্তের মধ্যে পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে আঘাত করে মাইক্রোবাসটিকে। ফলে পেছনের কাভার ভেঙে গুড়িয়ে যায় যেখানে মালপত্র, ক্যামেরার ব্যাগ ইত্যাদি রাখা ছিল। এরপর আরো কয়েকটি ট্রাক একইভাবে হার্ডব্রেক করতে গিয়ে সামনের ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ে। একটি ট্রাকের হেল্পার আহত হন। জানা যায় একটি সিএনজি চালিত অটোরিক্সা রাস্তার মাঝখানে যাত্রী নামাতে ব্রেক করে। পেছনের পিকআপ ভ্যানটিকে তাই বাধ্য হয়ে হার্ডব্রেক করতে হয়, ফলে সেকেন্ডের মধ্যে এতগুলো গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

মাননীয় এমামের নিরাপত্তা কর্মীরা ছুটে গিয়ে সিএনজি চালককে আটক করেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানটিতে মুহূর্তেই অনেক মানুষের ভিড় জমে যায়। অনেক ধাক্কাবাজ

লোকও এই দুর্ঘটনার ডামাডোলের মধ্যে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে। কার থেকে কীভাবে জরিমানা আদায় করা যায় সেটা নিয়ে গোলমাল বেঁধে যায়। গোলমালে জড়িয়ে পড়েন নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরাও। এই বিশৃঙ্খল মুহূর্তে মাননীয় এমাম নিজেই নেমে যান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে। তিনি গিয়ে চালকদের সঙ্গে ও গাড়ির মালিকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করেন। মাননীয় এমামের মুখে মাস্ক থাকায় কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। এমাম নেমে যাওয়ার পর এদিকে গাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ ছিল না, নিরাপত্তা বিভাগের সদস্যরাও ব্যস্ত ছিলেন। এসময় একজন লোক জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে গাড়ির চাবি ও কাগজপত্র হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন দ্রুত গাড়ির কাচ তুলে দরজা লক করে দেওয়া হয়। উত্তরার সদস্য জালাল উদ্দিনকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার মাইক্রোবাস নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য। নির্দেশ দেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জ জেলা আমিরসহ স্থানীয় সদস্যদেরকেও। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সেখানে চলে আসেন।

নির্দেশ পেয়ে জালাল উদ্দিন নিজ গাড়ির যাত্রীদের তৎক্ষণাৎ নামিয়ে দিতে বাধ্য হন এবং এজন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। এ সময় ঢাকা থেকে বের হওয়ার প্রত্যেকটি সড়কে থাকে ভয়ানক যানজট। তিনিও ঢাকার বনশ্রী থেকে ডেমরার সড়কে যানজটের শিকার হন। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহর সাহায্য আসে। একটি পিক আপ সরে গিয়ে তাকে নতুন একটা রাস্তার মুখে প্রবেশের সুযোগ করে দেয় যে রাস্তায় জালাল উদ্দিন কখনও যান নি। রাস্তাটিতে গাড়িঘোড়া কিছুই চলে না। তিনি দূরে একটি সাদা মাইক্রোবাস দেখতে পান এবং সেটাকে অনুসরণ করে যেতে থাকেন। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে মাইক্রোবাসটি তাকে অচেনা একটি রাস্তা দিয়ে মাতুয়াইল নিয়ে আসে। এর ফলে প্রায় দেড়ঘণ্টার নিশ্চিত যানজট তিনি পার হয়ে যেতে সক্ষম হন মাত্র দশ মিনিটে। রহস্যময় সেই সাদা মাইক্রোবাসটিকে তিনি আর দেখতে পান নি। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তার গাড়িতে করেই মাননীয় এমাম ও তাঁর পরিবারের সকলে ঢাকা ফিরে আসেন। তখন ঘড়িতে রাত বাজে আড়াইটা।

দুর্ঘটনার শিকার মাইক্রোবাসটি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সেটা মেরামত করতে এক লক্ষ টাকার বেশি খরচ হবে বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞজনেরা। কিন্তু দুর্ঘটনার কারণ যে সিএনজি চালক তার থেকে বা অন্য কারো থেকে কোনো জরিমানা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

টাঙ্গাইলে ধর্মব্যবসায়ীদের রোষাণলে বালাগকারীরা

• টাঙ্গাইল প্রতিনিধিঃ

বালাগ করতে গিয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছেন টাঙ্গাইলে বালাগকারী একটি গ্রুপ। ধর্মব্যবসায়ীদের উস্কানিতে এক মোজাহেদকে মারধর পর্যন্ত করে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। গত ৩ জুলাই বুধবার টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় সংকলন নিয়ে বালাগ করতে গেলে এ ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনার দিন পাঁচ জন মোজাহেদা ও একজন মোজাহেদ পাঁচশত সংকলন নিয়ে নিজস্ব গাড়িতে (সিএনজিচালিত অটোরিক্স) টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় বালাগে যান। বালাগ করতে গিয়ে তারা বুঝতে পারেন সেখানকার অধিকাংশ মানুষ হেযবুত তওহীদের বিপক্ষে। একটি বাজারে বালাগ শুরু করতেই লোকজন হেযবুত তাওহীদ ও মাননীয় এমামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করতে থাকে। প্রতিবাদ করলে মোজাহেদাদের সাথে বাজারের বিভিন্ন দোকানদারের কথা কাটাকাটি হয়। এরপর দুপুর আনুমানিক দুইটার দিকে বালাগকারীরা খাওয়ার বিরতি নেন। তারা নিজেদের অটোরিক্সয় এসে বসেন। আর মোজাহেদ সুজন মিয়া খাবারের ব্যবস্থা করতে যায়।

এসময় পাঁচজন ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা প্রায় তিনশত লোক নিয়ে এসে গাড়িকে ঘিরে ফেলে। তারা মোজাহেদাদেরকে গাড়ি থেকে নামতে বলে। ইতোমধ্যে সুজন মিয়াও ফিরে আসে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি অবরোধকারীদের তার সাথে থানায় যেতে বলেন। এতে মোল্লারা ক্ষেপে যায় এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। তখন মোজাহেদারা তাদের আমিরকে ফোন দিয়ে পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। আমির তৎক্ষণাৎ ঘাটাইল থানার ওসিকে বিষয়টি অবগত করেন।

এদিকে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা গাড়িতে থাকা প্রায় তিনশত সংকলন কেড়ে নেয়। তারা জনগণকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য বলতে থাকে যে, হেযবুত তাওহীদের এমাম ভণ্ড, নাস্তিক, হেযবুত তওহীদের সদস্যরা সবাই খ্রিষ্টান ইত্যাদি। এরপর তারা জনসাধারণকে মোজাহেদাদের বেঁধে, বস্ত্রহীন করে গায়ে গরম পানি ঢালার জন্য উস্কানি দেয়। এসময় সেখানকার এক শ্রমিক নেতা উস্কানিদাতা ধর্মব্যবসায়ী ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের হাত থেকে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের রক্ষা করার জন্য শ্রমিক সংঘের একটি অফিসে নিয়ে যান এবং সেখানে আটকে রাখেন। তাদের সাথে ধর্মব্যবসায়ীরাও যায়। এসময় তারা মোজাহেদাদের প্রত্যেকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এবং তাদের নিজেদের পক্ষের বিভিন্ন নেতাকর্মী ও স্থানীয়

সাবেক মেয়রকে ডেকে আনেন। তারাও এসে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং মোবাইলে ছবি তোলে ও ভিডিও করে।

পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ধর্মব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোনগুলো উদ্ধার করে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের কাছে ফেরত দেন। এরপর অফিস থেকে বের করে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষুব্ধ জনগণ মোজাহেদ সুজন মিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পরে এবং তাকে মারধর করে। প্রশাসন তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বিকেল পাঁচটার সময় ওসি থানায় আসেন এবং বলেন যে তিনি হেযবুত তাওহীদ সম্পর্কে অবগত আছেন। এরপর তিনি বিষয়টাকে একটি ভুল বোঝাবুঝি হিসাবে ব্যাখ্যা দিয়ে এসআইকে তাদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর এসআই সবার জবানবন্দি নিয়ে সাড়ে ছয়টার দিকে তাদের ছেড়ে দেন।

গজারিয়াতে চরমোনাই অনুসারী কর্তৃক বালাগে বাধা

• মাহমুদা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধিঃ

মুন্সিগঞ্জে প্রকাশনা বালাগ করতে গিয়ে কতিপয় ধর্মব্যবসায়ীর দ্বারা হয়রানির শিকার হন নারায়ণগঞ্জের কয়েকজন মোজাহেদা। তবে স্থানীয় লোকদের সহায়তার কারণে ঘটনাটি সংঘর্ষের রূপ নেয়নি।

১৮ আগস্ট মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার সোনালি মার্কেটে প্রকাশনা বালাগ করছিলেন হেযবুত তওহীদের নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গ্রুপ। বালাগকালে মোজাহেদা ফরিদা পারভীনকে বই বিক্রি করতে বাধা দেয় দুজন লম্বা জোব্বাধারী লোক। তাদের সঙ্গে মোজাহেদার তর্কবিতর্ক হয়। তারা বলে-

- এখানে আপনাদের বই বিক্রি করতে পারবেন না, আপনারা এখান থেকে চলে যান। যদি বই বিক্রি করেন তবে সমস্যা হবে।
- আপনি আপনার দোকানে যেতে নিষেধ করতে পারেন, কিন্তু এই পুরো মার্কেট তো আর আপনার না।"
- আপনাদের পর্দা নেই, আপনারা ঘরে থাকবেন, বাইরে কেন?"
- ইসলামের প্রথম শহীদ সাহাবা সুমাইয়া (রা.), তিনি তো ঘরে বসে শহীদ হন নাই, ময়দানে শহীদ হয়েছেন।"
- কিন্তু আপনারা যাকে এমাম বলেন তার তো দাড়ি টুপি লেবাস নাই"।
- বেলাল (রা.) তো তেমন কোনো পোশাক বা দাঁড়ি টুপি জোব্বা কিছুই ছিল না। এক্ষেত্রে আপনি কী বলবেন?
- আপনারা এখান থেকে চলে যান। আর কোনো বই আর বিক্রি করবেন না।
- এটা পাবলিকপ্লেস। এখানে কাজ করার অধিকার আমাদের আছে। এই বাজার কি আপনার যে, আপনি বই বিক্রি করতে বাধা দিচ্ছেন?
- আপনাদের ইসলাম বিরোধী বই এখানে বিক্রি করবেন না।

কথায় মোজাহেদাদের সঙ্গে না পারলেও গায়ের জোর আর হুমকি-ধামকির আশ্রয় নেয়। এরই মধ্যে সংবাদ পেয়ে হেযবুত তওহীদের সোনারগাঁও থানা আমির মো. রতন আলী ও মোজাহেদ ফরহাদ হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ধর্মব্যবসায়ীরা মো. রতন আলী ও ফরহাদ হোসেনের সাথেও উত্তেজিত আচরণ করতে থাকে। তারা বলে "আপনি কে? আপনি চুপ থাকুন। আপনিও কি এদের সাথের লোক? এদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন কেন?"

এক পর্যায়ে আশেপাশের অনেক ধর্মব্যবসায়ী ও চরমোনাইয়ের অনুসারী জড় হয়ে যায়। তাদের একজন ধর্মব্যবসা বই নিয়ে এসে, বইয়ের বিভিন্ন লাইন দেখিয়ে দেখিয়ে, বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথা বলে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করে। তারা বলে, "এরা আলেম বিরোধী, আলেমদেরকে গালাগালি করে ইত্যাদি"। সদস্য মোহাম্মদ রতন আলী তখন, সুরা ইয়াসিনের ২১ নং আয়াত তাদেরকে বলে যে, "অনুসরণ করো তাদের যারা কোনো বিনিময় চায় না এবং ও সঠিক পথে আছে।" ধর্মব্যবসায়ীরা পর্দার আয়াত আরবিতে বলতে বলে। মোহাম্মদ রতন আলী তখন তাদের কোরআন নিয়ে আসতে বললে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদাদের কোন কথাই শুনছিল না। তারা একটা সংঘাত সৃষ্টির পায়তারা করছিল। এরইমধ্যে তারা মোজাহেদ-মোজাহেদাদের হাত থেকে অনেকগুলো বই তারা জোর করে নিয়ে নেয়। তারা তুই-তোকারি শুরু করে এবং তাদের কোনো এক বড় চরমোনাইয়ের হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এসময় সেখানে থাকা কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী লোক হেযবুত তওহীদের পক্ষ নেয়। ফলে তাদের সাথেও ধর্মব্যবসায়ীদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর তারা মোজাহেদ মোজাহেদাদের সেখান থেকে চলে আসতে সহযোগিতা করে। ঘটনাপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রতন আলী বলেন, আমরা যদি ঘরে বসে না থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে মাঠে থাকি এবং বালাগ চালিয়ে যাই, তবে মোল্লাদের এমন বাধা যেমন আসবে তেমনি আমাদের সহযোগিতা করার লোকও তেমনি তৈরি হবে ইনশাল্লাহ।

ধর্মব্যবসায়ীর পতন

• **মোহাম্মদ রাসেল, হবিগঞ্জ:**

আলীম উদ্দিন নামে এক ধর্মব্যবসায়ী। তিনি আমাদের হবিগঞ্জ এলাকার স্থানীয় মসজিদের ইমাম ছিলেন। মসজিদের ইমাম হলেও যেহেতু এলাকার তাই বড় ভাই হিসেবে আমরা তাকে শ্রদ্ধাও করতাম। তাছাড়া তিনি তার থেকে ছোট ছেলেদের নিয়ে আড্ডা দিতেন, ঘুরাঘুরি করতেন। তো এক সময় দেখা গেল যে, আমরা যারা হেযবুত তওহীদ করি তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে শুরু করেন। আমাদের অগোচরে আমাদের অনেক বিষয়ে বদনাম করা শুরু করেন। তার সাথে আমার একবার মনোমালিন্য হওয়ায় এলাকার অনেক ছোট ভাইদের দ্বারা লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেন। এগুলোও সব সহ্য করে আল্লাহর কাছে বললাম, আল্লাহ তুমি বিচার কর।

একটা সময়ে এসে দেখা গেল সে অন্যসব ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এলাকায় অনেক প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। ধর্মব্যবসাসহ অনেক বড় বড় সিন্ডিকেট তৈরি করলেন। যেমন- মানুষ ধর্মীয় কোন প্রোগ্রাম করলে তার দোকান থেকে ডেকোরেশন সরঞ্জাম নিতে বাধ্য করাসহ নানান কর্মকাণ্ড। তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ মসজিদের কমিটির মধ্যে তাকে নিয়ে চলছিল আলোচনা সমালোচনা। এরপরে যখন তিনি রমজান মাসে তারাবিহ পড়ানোর টাকার ভাগ চাইতে গেলেন তৎক্ষণাৎ তাকে চাকরি হারাতে হল। শুধু তাই নয়, তার যে অন্য ব্যবসা ছিল সেখানেও তিনি লোকসানে পড়লেন। বর্তমানে তিনি পাশেরই আরেকটা মসজিদের ইমামকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিতাড়িত করে সেখানে ইমামের চাকরি নিয়েছেন। তবে এখন আর তাকে হেযবুত তওহীদ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে দেখিনা, আগ বাড়িয়ে, গলা উঁচু করে কথা বলতেও দেখি না।

সংস্কৃতি সংবাদ

এতায়াতের দৃষ্টান্ত

• **তাহামিনা আক্তার চাঁদ, মতিঝিল:**

সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্তি পাওয়া 'হাওয়া' সিনেমার একটি গান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গানটির শিরোনাম 'সাদা-সাদা, কালা-কালা'। গানটি এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, প্রায় সকলের মুখে মুখে গানের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে অনেক শিল্পী ও সঙ্গীতমনারা নিজেদের মতো করে গানটি পরিবেশন করেছেন।

এত জনপ্রিয়, ভাইরাল একটি গান রেকর্ড করা হলে নিঃসন্দেহ ভালো সাড়া পাওয়া যাবে। এমন চিন্তা থেকে হেযবুত তওহীদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহীন আলম গানটি গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি এবং তাঁর মেয়ে তাহী মিলে গানটি কাভার করেন অর্থাৎ নতুন করে গান। গানটি রেকর্ড ও শ্যুটিং করতে গিয়ে বেশ খরচও করেন তিনি। শ্যুটিং শেষ, রেকর্ড শেষ, অন্যান্য কাজগুলোও প্রায় শেষের পর্যায়ে এমন সময় মাননীয় এমাম নির্দেশ দেন যে, 'হেযবুত তওহীদের কেউ 'সাদা-সাদা, কালা-কালা' গানটি চর্চা করবে না। কারণ গানটিতে নারীকে হারাম নেশাদ্রব্যের সাথে তুলনা করে অশালীন ইঙ্গিত রয়েছে যা মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতায় প্ররোচিত করতে পারে।'

মাননীয় এমাম যখন গানটির চর্চা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন তখন শাহীন আলম কোনো প্রকার ইতঃস্তত না করে অর্থের লোকসানের দিকে না তাকিয়ে গানটি রিলিজ না করার সিদ্ধান্ত নেন। হেযবুত তওহীদের পাঁচ দফা কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দফা হচ্ছে আনুগত্য। শাহীন আলম সেই আনুগত্যের উদাহরণ সৃষ্টি করলেন।

মেরামত ছাড়াই ঠিক হল নষ্ট ফোন

• **হাফছা খান, নোয়াখালী:**

আমি নোয়াখালী শাখার বিপুলাসার পয়েন্টের একজন মোজাহেদা। আল্লাহ যে মো'মেনদের অভিভাবক এবং হেযবুত তওহীদ যে হক, সত্য তা অনেকবারই আমি উপলব্ধি করেছি। আবারও করলাম এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমি অনেক দিন ধরেই ফেসবুকে বালাগ করছি। আমিরের নির্দেশক্রমে আমরা কয়েকজন বোন গ্রুপভিত্তিকভাবে নোয়াখালী শহীদী জামে মসজিদে সাইবার টিমে কাজ করি। একটা মোবাইলেই আমি এবং আমার মেয়ে কাজ করি। কিন্তু হঠাৎ মোবাইলটা নষ্ট হওয়ায় আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। কিছুই ভালো লাগছিল না। কারণ আমার হাতে কোনো টাকা ছিল না। কীভাবে নতুন মোবাইল কিনব বা মেরামত করব, এই নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। তবুও আমি একটি

মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকানে গেলাম মোবাইল মেরামত করার জন্য। সেখানে দোকানদার যত টাকা দাবি করে তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরে আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসি। কিন্তু পরের দিন হঠাৎ খেয়াল করি মোবাইলে আলো দেখা যাচ্ছে। পরে আমি আবার মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকানে যাই। তখন দোকানদার মোবাইল দেখে বলে, আপনার মোবাইলের সব ঠিক আছে। তখনই আমার মনে পড়ল, এর একমাত্র কারণ হল আমি বালাগের জন্য আকুল ছিলাম এবং আল্লাহর কাছে মা'নত করেছিলাম।

মানতের তাৎক্ষণিক ফল

• **মায়া সুলতানা, মতিঝিল:**

গত ১ আগস্ট দুপুরে আমার স্বামী মো. জাহিদ হোসেন রিজিকের কাজ থেকে ফিরে তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়ে ধর্মব্যবসার ফাঁদে বইয়ের কাজের জন্য প্রেসের উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে রওয়ানা দেন। মোটর সাইকেলটা আমরা কিস্তিতে কিনেছি। এখনো সম্পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ করা হয়নি। ওখানে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সের কাভারের ভিতরে মোটর সাইকেলের রিসিটটা ছিল। পরে প্রেসে কাজ শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত সাড়ে ১১ টা বাজে। তারপরে তিনি ফ্রেশ হতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্যাকেটটা নেই। দেখে তিনি সাংঘাতিক অস্থির হয়ে পড়েন। তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেন, যেখানে যেখানে পকেট থেকে তিনি মোবাইল বের করেছেন সেখানে সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখবেন। যদিও আমাদের কোনো আশা ছিল না কারণ ঢাকা শহরের রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে ফেলে, আর এসব জিনিস সহজে খুঁজেও পাওয়া যায় না। তবুও নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি সেই প্রেসের সামনে যান আর আমিও যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেই। যেখানে যেখানে তিনি জ্যামে আটকা পড়েছেন সেখানে সেখানে গিয়ে খুঁজতে থাকেন। এর মধ্যে আল্লাহর দরবারে আমি কিছু মা'নত করি, জাহিদও মানত করেন। পরে আমি আবার আল্লাহকে স্মরণ করে বলি, এই ড্রাইভিং লাইসেন্স ফিরে পেতে অনেক হয়রানি ও বেশ অর্থও ব্যয় হবে। আমি তাই আরেকটু বেশি করে মা'নত করি। আমার মনে মনে মা'নত করা শেষও হয় নাই, ঠিক তখনই আমার ফোনে আমার স্বামীর কল আসে।

তিনি বলেন, যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে। সায়েদাবাদ ফ্লাইওভারের নিচে জ্যামে দাঁড়িয়ে তিনি যখন ফোন বের করেছিলেন তখন ড্রাইভিং লাইসেন্সটি পড়ে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি।

মোজাহেদার গায়ে হাত দেয়ায় জুতাপেটা

• **জেলা প্রতিনিধি, জামালপুর:**

কোরবানি ঈদের সর্বাত্মক পত্রিকা বালাগের অংশ হিসেবে জামালপুর সদরে পত্রিকা বালাগ চলছিল। বিকেল ৫টার দিকে সদরের সরদারপাড়া মোড়ে একটি টিম তখনও বালাগ চালিয়ে যাচ্ছিল। এর আগেও ওই জায়গায় অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু সেখানে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই হেযবুত তওহীদের কর্মীরা বিভিন্ন সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সেখানে কাজ করার সময় আমাদের পত্রিকা দেখে হঠাৎ এক দোকানদার ক্ষিপ্ত হয়ে হাতে জুতা নিয়ে এক মোজাহেদার দিকে এগিয়ে আসে এবং হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে থাকে। তখন জেসমিন আক্তার নামে সেই টিমের একজন মোজাহেদা দোকানদারের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করে। এক পর্যায়ে ব্যাগ থেকে তার ফোন বের করে আমিরকে বিষয়টি জানাতে গেলে দোকানদার তার দিকে ধেয়ে আসে এবং মোজাহেদার হাতের মোবাইলে থাবা মারে। এরপর সে জেসমিন আক্তারের গায়ে হাত তোলে। তখন পিছন থেকে সরিষাবাড়ি উপজেলা আমির ও এক মোজাহেদ আটকাতে গেলে তাদের মধ্যে কিছুটা হাতাহাতি হয়। যখন দেখা যায়, লোকটি কোনো কিছুতেই আর থামছে না; তখন জেসমিন আক্তার নিজের জুতা খুলে সবার সামনে দোকানদারকে জুতাপেটা করে। এসময় আশপাশের দোকানদারেরা একজন নারীর গায়ে হাত তোলার জন্য দোকানদারকে ভর্ৎসনা করেন। ইতোমধ্যে ঘটনাস্থলে আরো লোকজন জড়ো হয়, তারা পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্য করতে থাকে। এমতাবস্থায় আমীরের নির্দেশে ওই টিম সেখান থেকে চলে আসে।

প্রকাশনা বলাগে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বাধা

• **মোহাম্মদ রতন আলী**

গত ১৮ আগস্ট মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার সোনালী মার্কেট বাজারে প্রকাশনা বালাগের সময় দুই মোল্লা বই বিক্রি করতে বাধা দেয়। মোল্লারা বলেন, "এখানে আপনাদের বই বিক্রি করতে পারবেন না, আপনারা এখান থেকে চলে যান। যদি বই বিক্রি করেন তবে সমস্যা হবে।" এই কথার উত্তরে ফরিদা পারভীন আপা তখন বলেন, আপনি আপনার দোকানে যেতে নিষেধ করতে পারেন , পুরো মার্কেট তো আর আপনার না। তখন সেই মোল্লা বলে, "আপনাদের পর্দা নেই, আপনারা ঘরে থাকবেন বাইরে কেন?" ফরিদা পারভীন বলেন, "সুমাইয়া (রা.) প্রথম শহীদ মুসলিম নারী তিনি তো ঘরে বসে শহীদ হোন নাই, ময়দানে শহীদ হয়েছেন।" তখন মোল্লা কথা ঘুরিয়ে বলে, "আপনারা যাকে ইমাম বলেন তারতো দাঁড়ি টুপি লেবাসনাই"। ফরিদা পারভীন বলেন, "বেলাল (রা.) তো তেমন কোনো পোশাক বা দাঁড়ি টুপি জোব্বা কিছুই ছিল না। এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? পরে সেই মোল্লা বলে আপনারা এখান থেকে চলে যান কোনো বই আর বিক্রি করবেন না"। ফরিদা পারভীন "এটা পাবলিক জায়গা। এখানে কাজ করার অধিকার আমাদের আছে। এই বাজার কি আপনার যে আমরা বই বিক্রি করতে বাধা দিচ্ছেন!" মোল্লা, "আপনাদের ইসলাম বিরোধী বই এখানে বিক্রি করবেন না।" এভাবে হুমকি ধামকি দিতে দেয়। তখন আমি মো. রতন আলী ও ফরহাদ হোসেন কাছে এগিয়ে যাই। তাদেরকে বলি সমস্যা কি ভাই উনারা তো বই বিক্রি করছে, আপনারা এমন করছেন কেন? বলে "আপনি কে? আপনি চুপ থাকুন। আপনি কি এদের সাথের লোক এদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন কেন?"

তারা তখন আশেপাশের অনেক লোক জড়ো করে যাদের অধিকাংশই মোল্লা ও চরমোনাই এর অনুসারী। একজন ধর্মব্যবসার বই নিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছিলেন যে নামাজ পড়িয়ে টাকা নেওয়া নাকি ধর্মব্যবসা ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না। এরা আলেমবিরোধী, আলেমদেরকে গালাগালি করে ইত্যাদি বলে সবাইকে বিভ্রান্ত করছিল। আমি তখন বললাম সূরা ইয়াসিনে আল্লাহ বলেছেন, "অনুসরণ করো তাদের যারা কোনো বিনিময় গ্রহণ করে না ও সঠিক পথে চলে।" পর্দার আয়াত আরবিতে বলতে বলে। বললাম, "কোরআন নিয়ে আসেন দেখিয়ে দিচ্ছি"। তখন বলেন, আমরা সব জানি বেশি কথা বলবেন না। তারা আমাদের কোনো কথাই শুনছিলনা। কোনো কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছিলোনা। ইতোমধ্যে তারা আমাদের অনেকগুলো বই হাত থেকে জোর করে নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে একজন তুই তোকারি শুরু করে এবং আমাদেরকে তাদের কোনো এক বড় চরমোনাই এর হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে চায়। এসময় সেখানে থাকা কিছু লোক আমাদের পক্ষ নেয় এবং তাদের মাঝে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ৪ জনকে সেখান থেকে চলে আসতে কয়েকজন সহযোগিতা করে।

এই ঘটনায় উপলব্ধি: আমরা যদি ঘরে বসে না থেকে আল্লাহর উপর ভরসা করে মাঠে নামি। বই, পত্রিকা, সংকলন নিয়ে বালাগ করি তবে মোল্লাদের এমন বাধা যেমন আসবে তেমনি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য কিছু লোক অবশ্যই আসবে।

বালাগে বাধা; অতঃপর মোল্লার ক্ষমা প্রার্থনা ও জরিমানা

• **সাইদুর রহমান তানভীন, ফরিদপুর:**

গত ২৯ জুন ২০২২ তারিখ আমরা তিন ভাই ফরিদপুর সদর উপজেলার গজারিয়া নামক স্থানে সংকলন বালাগে বের হই। বেলা ১২টার পর পর আমারা যখন সে স্থানে অবস্থিত একটি বাজারে কাজ শুরু করি তখন মোকাদ্দেস নামের এক মোল্লা বালাগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করে। সে মানুষকে ডেকে ডেকে আমাদের দেখিয়ে বলতে থাকে 'আমরা জঙ্গি সংগঠনের লোক, আমরা ইসলামবিদ্বেষী কাজকর্ম করি, আমরা ইসলামকে ধ্বংস করতে কাজ করছি'। এসব কথা বলে আশেপাশের লোকজনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। মোল্লার কথা শেষে আমরা যখন সবার উদ্দেশ্যে বলার চেষ্টা করি যে আমরা বৈধ আন্দোলন, আমরা মানবতার কল্যাণে কাজ করি, আমরা প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরেছি তখন ঐ মোল্লা পুনরায় আমাদের কথা থামিয়ে দিয়ে মিথ্যাচার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তখন আমরা আবারও বলি যে, আমাদের কথা ভালো না লাগলে আপনারা এড়িয়ে চলুন। আমরা তো কাউকে জোর করছি না। তাছাড়া আমরা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে কাজ করছি। তারপরও যখন সে ঝামেলা করতে চেষ্টা করে তখন আমরা আমিরকে কল করলে আমির একজন ভাইকে পাঠান। তিনি এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

এরপর সেখান থেকে আমরা একটা অটো করে রওনা হই। কিন্তু সেই মোল্লা আবার কিছু মাদ্রাসার ছাত্র নিয়ে রাস্তায় আমাদের অটো থামিয়ে তর্ক করতে থাকে। এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয় তাদের সাথে। আমাদেও কাছ থেকে কিছু সংকলন কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে তারা।

পরবর্তীতে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় সেই মোল্লা মোকাদ্দেসসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ সরেজমিনে গেলে ঘটনার সত্যতা পায়। পরে সেই সেই মোল্লা মোকাদ্দেস ক্ষমা চেয়ে এই বলে জবানবন্দী দেয় যে- আগামীতে হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। এবং ঘটনার দিন কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলা সংকলনের মূল্য পরিশোধ বাবদ জরিমানা আদায় করা হয়।

মোজাহেদার হুঙ্কার: “হু আর ইউ?”

রংপুরের মাহীগঞ্জ শাখার মোজাহেদা আদুরি বেগমের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পত্রিকা বিক্রিতে বাধাপ্রদানকারী ধর্মব্যবসায়ীরা। মোজাহেদা মনিকা আক্তার এই দৃশ্যধারণের সময় তার ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

• তামান্না জাহান রিমি, রংপুর প্রতিনিধি:

রংপুরে দৈনিক দেশেরপত্র পত্রিকা বিক্রয়কালে চারজন মোজাহেদাকে পথরোধ করে হেনস্থা ও পত্রিকা ছিনিয়ে নেয় কয়েকজন ধর্মব্যবসায়ী। ৩০ আগস্ট মহানগরীর বদরগঞ্জ রোডের সুলতান মোড় নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পত্রিকাটির জেলা সার্কুলেশন ম্যানেজার মনিরুজ্জামান বাদি হয়ে রংপুর মহানগর কোতয়ালী থানায় দুইজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১২ জনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার দিন দুপুরে আদুরী বেগম, মনোয়ারা বেগম, আশামনি ও মনিকা আক্তার পত্রিকা বিক্রয়কালে পীরজাবাদ হামিউছসুন্নাহ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি আব্দুল্লাহ, ড্রাইভার মন্টু মিয়াসহ উগ্রবাদী প্রকৃতির আরও অজ্ঞাতনামা ১০/১২ জন পথরোধ করে তাদের হাত থেকে পত্রিকা ছিনিয়ে নেয়। মোজাহেদারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তারা তর্জনি উঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলেন, “হু আর ইউ? আপনি কে? আপনি কি রাষ্ট্রপ্রধান?’ মোজাহেদার রক্তচক্ষুর সামনে ভড়কে গিয়ে ধর্মব্যবসায়ীরা মিনমিন করে নিজেদেরকে ইসলামের সৈনিক বলে দাবি করে। একজন মোজাহেদা মোবাইল ফোনে পত্রিকা ছিনিয়ে নেয়ার ভিডিও ধারণ করতে ধরলে বাধাদানকারীরা তার হাতে থাকা মোবাইল ফোন ও ভ্যানিটি ব্যাগ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন মোজাহেদারা চিৎকার করে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছু লোক তাদেরকে সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়ে। তবে যাওয়ার আগে তারা ওই এলাকায় পত্রিকা বিক্রি করলে জানে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। জানা গেছে কওমি মাদ্রাসাটি তাবলিগ জামায়াতের একটি কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

রংপুর মহানগর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই সরওয়ার হোসেন বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্তপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

টিকিট ছাড়াই ৬টি সিট

• কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:

হেযবুত তওহীদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর উত্তরায় আয়োজিত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে কুষ্টিয়া থেকে ৬ জন মোজাহেদ ভেড়ামারা রেলস্টেশনে ট্রেনের টিকিট কাটতে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, ট্রেনের সব সিট বুকিং হয়ে গেছে। যেতে হলে ঢাকা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যেতে হবে। টিকিট না পেয়ে তারা বাস কাউন্টারে যান, কিন্তু সেখানেও কোনো টিকিট পান না তারা। কিন্তু আমির যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা যেভাবেই হোক পালন করবেন। যে সময়ের মধ্যে তাদের ঢাকায় পৌঁছানোর কথা তারা সেই সময়ের মধ্যেই ঢাকা পৌঁছাবেন এমন সিদ্ধান্ত নেন, সেটা হেঁটে হোক আর দৌড়ে হোক। তারপর তারা আবার ট্রেন কাউন্টারে গিয়ে স্ট্যান্ডিং ছয়টি টিকিট কাটেন। ট্রেন আসার পর তারা প্রথমেই যে বগিতে ওঠেন আশ্চর্যজনকভাবে সে বগির ছয়টি সিটই ফাঁকা ছিল এবং কুষ্টিয়া থেকে উত্তরা পর্যন্ত টানা সাত ঘণ্টার পথে সেই ছয় সিটে কোনো যাত্রীই ওঠে না। তারা আরামে সিটে বসেই ঢাকা পৌঁছান।

উত্তরার অনুষ্ঠান বন্ধের ষড়যন্ত্র!

• নিপা প্রধান, উত্তরা প্রতিনিধি।

উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মাননীয় এমামের একটি আলোচনা সভার অনুমোদন নিয়ে আয়োজকদেরকে বিরাট সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকি অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট আগেও অনুষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়। কেবল মোমেনদের দৃঢ়তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে সেখানে বিজয় দান করেন।

২৮ জুন ২০২২ তারিখের এ অনুষ্ঠানটির মূল আয়োজক ছিলেন ঢাকা মহানগরী উত্তরা শাখার আমির মুস্তাফিজুর রহমান টিটু। অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল চারটায়। হলটি ছিল ঢাকা (উত্তর) সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন। সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ করে হলের ম্যানেজার আব্দুল মান্নান উত্তরার আমির মুস্তাফিজুর রহমানকে ফোন করে বলেন যে, 'একটু সমস্যা আছে, আপনাদের সাথে কথা বলতে হবে।'

আমির তার সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন কী সমস্যা। ম্যানেজার আব্দুল মান্নান বলেন, 'আপনাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে।' আমির জানতে চাইলেন, 'কে আপনাকে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলেছে, তার নাম কী?' তিনি কারো নাম বলতে অস্বীকৃতি জানালে আমির বললেন, 'আমাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। কারন উত্তরা পুলিশের ডিসি মহোদয় অনুষ্ঠানটির লিখিত অনুমোদন দিয়েছেন।'

হল ম্যানেজার তখন তাকে রাজউকের সচিবের সাথে দেখা করে অনুমতি নিতে বলেন। উত্তরার আমির তাকে এবং সংশ্লিষ্ট একজন পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে রাজউকের সচিব মো. নাসিমের কাছে যান। সচিব সাহেব পুলিশের ডিসির অনুমোদন পত্র দেখে বলেন, 'উনাদের যা লাগে সবরকম সাহায্য সহযোগিতা করেন।' এ কথার পরে আর অনুষ্ঠান করতে কোনো বিঘ্ন হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাননীয় এমাম অডিটোরিয়ামে এসে উপস্থিত হন।

মুস্তাফিজুর রহমান টিটু জানান, আজমপুর দক্ষিণখান এলাকার সদস্য-সদস্যারা কয়েকদিন থেকেই স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের ঘণ্টাখানেক আগে এলাকার ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিতে জড়িত একটি গোষ্ঠী নিমন্ত্রিতদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে অনুষ্ঠানে আসতে নিষেধ করে। অবশ্য তাদের সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা কেউ করেনি। অতিথিরা যথাসময়ে অনুষ্ঠানস্থলে চলে আসেন এবং পুরো সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে, অনুষ্ঠানটি বন্ধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতাদের উপরেও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

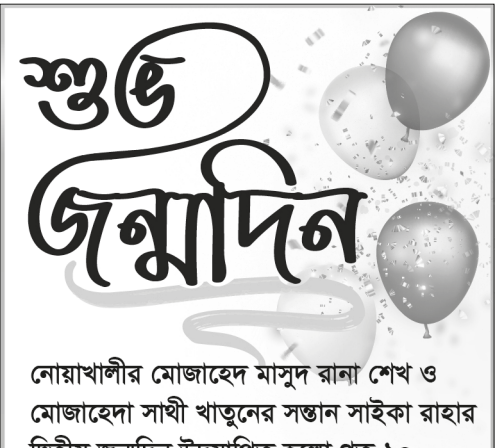

নোয়াখালীর মোজাহেদ মাসুদ রানা শেখ ও মোজাহেদা সাথী খাতুনের সন্তান সাইকা রাহার দ্বিতীয় জন্মদিন উদযাপিত হলো গত ১০ আগস্ট ২০২২। শিশু সাইকা রাহা যেন দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আল্লাহর বীর মোজাহেদ হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তার বাবা-মা সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

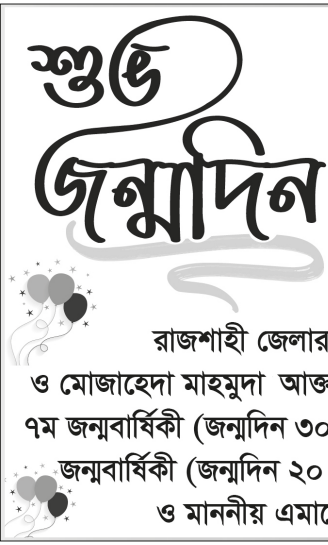

রাজশাহী জেলার মোজাহেদ রফিকুল ইসলাম ও মোজাহেদা মাহমুদা আক্তার সম্পার কন্যা নুশরাত জাহান রুকুর ৭ম জন্মবার্ষিকী (জন্মদিন ৩০ অক্টোবর) এবং পুত্র মো. রোকনের ২য় জন্মবার্ষিকী (জন্মদিন ২০ আগস্ট)উপলক্ষে মো'মেন মো'মেনা ও মাননীয় এমামের দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

ভ্র ম ণ পা তা

প্রশাসনিক বালাগ ও হাওরদ্বীপ খ্যাত খালিয়াজুড়ি ভ্রমণ

নাহার মিতু

ভ্রমণ শিক্ষার বড় একটি অংশ। ভ্রমণ মানুষের চিন্তার জগতকে আরও বিস্তৃত করে। ভ্রমণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। আপন করে নেওয়া যায় অচেনা পৃথিবীকে। একঘেয়েমি জীবন থেকে নিজেকে একটু সময় দেওয়ার জন্য ভ্রমণের বিকল্প কিছু নেই। শরীর ও মন যখন একঘেয়েমিতে ভরে ওঠে, তখন নিত্যদিনের সেই চারপাশ আর ভালো লাগে না। আমাদের মন তখন একটু মুক্তির জন্য ছটফট করতে থাকে। ভ্রমণ ক্লান্তি ও গ্লানিতে ভরে ওঠা মনকে সতেজ করে তুলে।

আমাদের এবারের গন্তব্য হাওরদ্বীপ খ্যাত উপজেলা খালিয়াজুড়ি। প্রচলন আছে, 'যেখানে নেই রাস্তা ও গাড়ি, তার নাম খালিয়াজুড়ি'। খালিয়াজুড়ি নেত্রকোনা জেলার একটি উপজেলা। যাকে হাওরের দ্বীপও বলা হয়। খালিয়াজুড়ি উপজেলায় প্রশাসনিক বালাগ কার্যক্রম করা ও সেখানে আনন্দ ভ্রমণ এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে আমরা নেত্রকোনা থেকে যাত্রা শুরু করি। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা রেলস্টেশনে যাই। নেত্রকোনার বড় স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে বাঁদরঝুলা হয়ে প্রথমে মোহনগঞ্জ পৌঁছাই। মোহনগঞ্জ স্টেশন থেকে আমরা অটোতে চড়ে মাঘান ঘাট যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের মোহনগঞ্জের ভাই-বোনেরা বড় ট্রলার ভাড়া করে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন।

ট্রলার দেখে আমি তো অবাক! এত সুন্দর আর বড় ট্রলার! আমরা সবাই মিলে ট্রলারের ছাদে গিয়ে বসলাম। ট্রলারে সবাই মিলে মোট ৬৮ জন যাত্রী। মাঘান ঘাট থেকে ট্রলার যখন খালিয়াজুড়ির উদ্দেশ্যে ছাড়লো তখন ঘড়িতে প্রায় ১০টা। ট্রলার ছেড়ে দেওয়ার পরই চারপাশের দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টে যেতে লাগলো। অদ্ভুত এক মায়াবী নিস্তব্ধতা এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। ডিঙ্গাপোতা হাওরের বুক চিঁড়ে চলছে আমাদের ইঞ্জিন চালিত ট্রলার।

ডিঙ্গাপোতা হাওর দেশের বড় বড় হাওরগুলোর মধ্যে একটি। প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি হাওর। বিশাল এ জলাশয় বর্ষাকালে সমুদ্ররূপ ধারণ করে। হাওরটির মোট আয়তন ৮,৫০০ হেক্টর। ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এই হাওরের সৌন্দর্য ফুটে উঠে। একদিকে ডিঙ্গাপোতা হাওর আরেকদিকে ধনু নদী। বর্ষাকালে নদী আর হাওর এক হয়ে সাগরের রূপ নেয়। যেদিকে তাকাই শুধু পানি আর পানি। বিশাল জলরাশিতে গ্রামগুলো তখন দ্বীপের মতো দেখা যায়। ভাসমান দ্বীপ হয়ে অসহায় ভেলার মতো গ্রামগুলো ভাসতে থাকে।

ট্রলারে ভ্রমণের সময় আমাদের ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণ করার হিড়িক পড়ে যায়। যে যার মতো হাওর, নদী, পানি ও চারপাশের দৃশ্যকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তুলছে। কেউ কেউ আবার প্রিয়জনদের ভিডিওকলে হাওরের রূপ দেখাচ্ছে। হাওরজুড়ে ছিল পুবাল বাতাস, যা মুহূর্তেই মনকে উদাসী করে তোলে। বাতাস আর ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলছে আমাদের ট্রলার। মাঝে মাঝে ভারি বাতাস এসে আস্কারা দেয় হাওরের পানিকে। ঢেউ তখন আরও গর্জে ওঠে। ট্রলারের গায়ে ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে পানির ঝাপটা এসে ছুঁয়ে যায় আমাদেরকে। কেউ কেউ বাইনোকুলার দিয়ে হাওরের রূপ দেখছে। হাওরের প্রতিটা ক্ষণ উপভোগের। অথৈ জলরাশির রূপ মুহূর্তেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আপনাকে বাকরুদ্ধ করে দিবে। হাওরের এই অপরূপ দৃশ্যপট যে কোন ভ্রমণপিপাসু মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

হাওরের চারপাশের প্রকৃতি আর পানির খেলা দেখতে দেখতে চলে এলাম খালিয়াজুড়ির কাছে। প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ভ্রমণ করার পর আমাদের ট্রলার এসে পৌঁছায় খালিয়াজুড়ির ঘাটে। খালিয়াজুড়ি থানায় প্রশাসনিক বালাগ এবং প্রকাশনা বালাগ করার জন্য, আমরা ট্রলারে করে আন্দোলনের বই-সংকলন নিয়ে এসেছিলাম। বালাগের জন্য ছোট ছোট টিম গঠন করা হলো। এরপর আমরা বেরিয়ে গেলাম বালাগের উদ্দেশ্যে। সেখানে প্রশাসনিক বালাগও করা হলো, আন্দোলনের বই-সংকলন সৌজন্য কপি দেওয়া হলো।

আবহাওয়া বৈরী থাকার কারণে অল্প সময় বালাগ করে আমরা সকলেই ট্রলারে ফিরে আসি। দুপুরের খাবারের জন্য ট্রলারে করে বিরিয়ানি রান্না করে নিয়ে আসা হয়েছিল। ট্রলারে বসেই আমরা রসনা ভোজ সম্পন্ন করলাম। এরই মধ্যে বৃষ্টি পড়া শুরু করলো। বৃষ্টি বাড়ছে আর আমাদের ট্রলারও চলা শুরু করেছে। ঝুম বৃষ্টি। হাওরের বুকে ট্রলারে বসে বৃষ্টি বিলাশ- এ এক অন্যরকম অনুভূতি! ভয়ংকর সুন্দর বলে যে একটা কথা আছে, এটা আমি সেদিন বুঝতে পারলাম। বৃষ্টিতে হাওর উত্তাল। শান্ত রূপ পাল্টে হাওর বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ নিলো। বড় বড় ঢেউয়ের কবলে পড়ে ট্রলার আমাদের প্রায় উল্টে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি তো ভয়ে একদম জমে গেছি। মনে হচ্ছিলো এই বুঝি আমাদের ট্রলার ডুবে গেলো। আমরা তখন সবাই ভয়ে হিম।

অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর যখন বৃষ্টি থামলো আমরা তখন সবাই আবার ট্রলারের ছাদে উঠে এলাম। শুরু হলো ট্রলারের ছাদে ঈদ পুনর্মিলনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। কেউ গান গাইলো, কেউ কবিতা আবৃত্তি করলো, ছোট ছোট বাচ্চারা নৃত্য পরিবেশন করলো। ঈদে সর্বাত্মক বালাগ ও প্রকাশনা বালাগকারীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হলো। পুরষ্কার তুলে দিলেন হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক রিয়াদুল হাসান।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের বুকে। আমাদের ট্রলারও এসে পৌঁছাল মাঘান ঘাটে। ট্রলার থেকে নেমেই আমরা আবারও ঝুম বৃষ্টির কবলে পড়লাম। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আমরা মাঘান ঘাট থেকে অটোতে করে কাকভেজা হয়ে মোহনগঞ্জ স্টেশনে আসলাম। সন্ধ্যা ৬টার ট্রেন ধরার কথা থাকলেও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আমরা ট্রেন মিস করলাম! একদিকে ঝুম বৃষ্টি আরেক দিকে স্টেশনে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। এদিকে হঠাৎ করে শুনলাম স্টেশনে নাকি চোর ঢুকেছে। কি একটা ভয়ংকর অবস্থা! দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাত সাড়ে আটটায় কাঙ্ক্ষিত ট্রেন এসে পৌঁছায়। অবশেষে আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। সব মিলিয়ে সেদিনের ভ্রমণটা সত্যিই খুব উপভোগ্য ছিল।

সিলেটে বিভাগীয় মিটিং

মাইলফলক ছোঁয়ার আনন্দ

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

আটটি জেলা নিয়ে আমাদের সিলেট অঞ্চল। সিলেট বিভাগের সম্মানিত আমির মো. আলী হোসেন সাধারণত প্রতি মাসের শুরুতেই বিভাগের বিভিন্ন জেলাগুলোর জেলা আমির ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নিয়ে একটি বিভাগীয় মিটিং করে থাকেন। তো এবারের মিটিংটি ছিল চলতি মাসের ০২ তারিখ (২ আগস্ট) চায়ের দেশ সিলেটে। মিটিংয়ের নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই আমি আমার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। অফিস থেকে তিনদিনের ছুটি নিয়ে নিই। ট্রেনের টিকিট কাটাসহ অন্যান্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা মিটিংয়ের আগের দিন রাতের ট্রেনে ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। আমাদের ট্রেন ছিল উপবন এক্সপ্রেস, যা রাতের ৮.৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে ভোর ৪.৩০ মিনিটে আমদেরকে সিলেট নামানোর কথা। সুখকর বিষয় হলো, ট্রেন ঠিক সময়ে ছেড়েছিলো এবং নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই আমাদেরকে সিলেট নামিয়ে দেয়।

এই মিটিংটি এবং এইবারের সিলেট যাওয়া আমার কাছে একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে। তার কারণ মূলত দুইটা- (১) এইবারই প্রথম আমি সিলেট গেলাম, (২) আমি আর আমার সহধর্মীনি এবারই প্রথম এতো অল্প সময়ে এতো লম্বা রাস্তা ভ্রমণ করলাম। উল্লেখ্য, আমার সহধর্মীনি নারায়ণগঞ্জ জেলা অনলাইন প্রচার সম্পাদক হওয়ার কারণে সেও এই মিটিংয়ের একজন সদস্য হয়ে যায়।

মজার বিষয় হলো, আমরা যে ট্রেনটিতে করে গিয়েছিলাম এতে আমরা মোট ১৭ জন একত্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ১৭ জন বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিভিন্ন সময়ে ট্রেনে উঠেন। কেউ ঢাকা স্টেশন থেকে তো কেউ নরসিংদী স্ট্রেশন থেকে। আমাদের বিভাগীয় আমির ট্রেনটি ধরেন শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশন থেকে। সেই মধ্যরাতে হঠাৎ জানা যায়, ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে থামবে না। অগত্যা আমিরকে শায়েস্তাগঞ্জ এসে ট্রেন ধরতে হয়। একত্রে অনেকজন একই ট্রেনে যাওয়ার কারণে আমাদের যাত্রার সময়টুকু ছিল বেশ হাসি আনন্দে ভরপুর। ট্রেন থেকে নেমে আমরা সবাই রেল স্টেশনেই সংক্ষিপ্ত ফটোসেশন সেরে ফেলি। ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা যখন সিলেটের আমিরের বাসায় গিয়ে উঠি তখন সূর্যের আলো প্রায় ফুটে উঠেছে। সেখানে আমরা ফ্রেশ হয়ে ফজরের সালাহ কায়েম করে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সকাল ৮টার মধ্যেই মিটিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। অবাক করা বিষয় হলো, সকালে আমাদের জন্য যে নাস্তা ছিল তা রাতেই রান্না করা হয়ে গিয়েছিল এবং এটা করেছিলেন সিলেটে আমাদের কয়েকজন স্থানীয় ভাই (যেহেতু সেই বাসায় কোনো বোন ছিলেন না)। ভাইদেরকে জাজাকাল্লাহ, তাদের রান্না ছিল অসাধারণ।

সিলেট জেলা অফিসটি কিছুটা ছোট হলেও তা ছিল প্রধান সড়ক এবং রেল লাইনের পাশেই। একেবারে খোলা জায়গায়। লোডশেডিংয়ের কারণে মিটিংয়ের শুরুর সময়টাতে সবার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই বিদ্যুৎ চলে আসে এবং কী অবাক বিষয়- আর সারাদিনে বিদ্যুৎ যায়নি। মিটিংয়ের মোট উপস্থিতি ছিল ৩৮ জন। মিটিংয়ের মাঝখানে আমাদের দুপুরের খাবারের আয়োজন ছিল। সিলেটের দুইজন বোন এবং একজন ভাই রান্না করেন। তাদেরকে জাজাকাল্লাহ, খাবার এতোই সুস্বাদু হয়েছিল যে, সবাই বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন।

মিটিংয়ের শেষের দিকে মাননীয় এমাম আমাদের সবার সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। তিনি সবার খোঁজ-খবর নেন এবং আন্দোলনের কার্যক্রমের বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। মাননীয় এমামের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের বিষয়টা আমাদের বিভাগীয় আমির সব বিভাগীয় মিটিংয়েই করে থাকেন। এ পর্বটা মিটিংকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

মিটিং শেষে আমরা সিলেটের চা বাগান ঘুরে দেখতে যাই। দুইটা লেগুনায় করে আমরা ২০ জনের মতো মোজাহেদ-মোজাহেদা ঘুরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ায় আমরা চা বাগানের গভীরে ঢুকতে পারিনি। পরে ভিন্ন পথে চা বাগানের কিছুটা ভেতরে গিয়ে ঘুরে আসি। এরপর পাশেই সিলেট ওসমানী স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকাও ঘুরে দেখি।

এবার ফেরার পালা। আগেই ট্রেনের টিকিট না কাটায় আমাদেরকে বিপাকেই পড়তে হয়। তবে আমার সাথে আমার সহধর্মীনি থাকায় আমি আলাদাভাবে বাসে করে ঢাকায় ফিরি। কিন্তু অন্যরা ট্রেনেই ফেরেন। সিট না পাওয়ায় তাদের ক্লান্তিময় যাত্রার সমাপ্তিটা আরও ক্লান্তিময় হয়ে ওঠে।

সা হি ত্য পা তা

যারা জানে তারা জানে, একজন শহীদ কত মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়; কত মানুষের হৃদয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়ে অমরত্ব কেনার নেশা সৃষ্টি করে; কত মোমেনকে শহীদ হওয়ার জন্য পাগল করে দেয়। যে উগ্রবাদী ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা হেযবুত তওহীদের নির্দোষ সদস্যদের উপর হামলা চালায়, তাদের রক্তপিপাসা মেটাতে রাস্তায় নেমেছে হেযবুত তওহীদ। এবার তারা দেখতে পাবে রক্ত কিভাবে রক্ত ডেকে আনে। হেযবুত তওহীদ কেবল মরতে আসে নাই। হেযবুত তওহীদ পথ ছাড়তে আসে নাই। হেযবুত তওহীদ তোমাদের ধান্ধাবাজির রাজনীতি করে না, হেযবুত তওহীদ জেহাদ করে। জেহাদ কাকে বলে- যারা জানে তারা জানে।

শহীদ

মো. রিয়াদুল হাসান

ভেঙে অজস্র শব্দের ভুল,
ফোটাতে নরকে স্বর্গের ফুল,
অপশক্তির সংঘাতে প্রাণ যে দেয়-
সে শহীদ। সে শহীদ।
মায়া-বন্ধন ছিন্ন করে
স্রষ্টার ডাকে-মানুষের তরে
নিঃসংকোচে হাসিমুখে প্রাণ যে দেয় -
সে শহীদ। সে শহীদ।

.

কোন ময়দানে তাকে পাওয়া যাবে
তৃষাতুর হয়ে পানির অভাবে
মরুপ্রান্তরে ছুটে মরে এক মোমেনের অন্তর।
ডাকে পরিজন পিছুটান হয়ে
সম্মুখপানে তবু চলে ধেয়ে
খোঁজে কোনখানে পরমাত্মার মিলনের বন্দর।

.

আসবে যখন মাহেন্দ্রক্ষণ
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেকি বন্ধন
আঘাতে আঘাতে প্রতি ফোটা খুন যে দেয়-
সে শহীদ। সে শহীদ।

.

যেখানে রুদ্ধ ন্যায়ের দুয়ার,
সুশীলের বেশ ধরে জানোয়ার,
যুগ যুগ ধরে জমা করে দুঃখী মানুষের কঙ্কাল,
স্বার্থ যেখানে ধর্ম সবার-
ধর্ম শোষণের হাতিয়ার,
বাদ-মতবাদে গণমাধ্যমে মগজের জঞ্জাল।

.

আনতে সেখানে শান্ত সুদিন
যুদ্ধের সাজে সেজেছে নবীন-
তাঁর ইঙ্গিতে অকাতরে প্রাণ যে দেয়,
সে শহীদ। সে শহীদ।

ব্যর্থ সভ্যতার কথা

মো. আল শাহরিয়ার তামিম

আমরা চরম ব্যর্থ।
বন্ধুরা, আমরা পৃথিবীর ব্যর্থদের ছোট একদল প্রতিনিধি।
আমরা ব্যর্থ
আমরা এতোটাই ব্যর্থ যে,
এখন আর কোনো কবি আমাদের নিয়ে কবিতা লেখে না,
কোনো গায়ক আমাদের নিয়ে গায় না- ব্যর্থতার গান।
আমরা এতোটাই ব্যর্থ যে,
শিল্পকলা কিংবা সংস্কৃতিকে সৃজনশীল-
মহান কিছু দিতে পারিনি।

আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের চরম ব্যর্থ।
আমরা অরণ্য এবং শিশুর হাসির মতো ফুলের বাগানকে-
যন্ত্র আর ধোয়ার শহরে রূপ দিয়েছি।
যেখানে শিশুরা চোখ মেলে মাথার উপর পাখির বদলে
বোমারু বিমান দেখে।
আমরা নিজেরাই আজ মহামারীতে পরিণত হয়েছি।
আমরা এতোটাই ব্যর্থ যে,
নানা রকম হিংস্র প্রাণী গবেষণা করে আদিম জাতের
খোঁজ পেয়েছি-
কিন্তু নিজেরা মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি।

হা হা হা কি হাস্যকর! কি হাস্যকর !
আমরা ধনুক থেকে মিসাইল তৈরি করেছি,
কিন্তু কোনো শিশুর বেঁচে থাকার নিরাপত্তা দিতে পারিনি।
আমাদের নারীরা আজ ব্যর্থ।
তারাও এখন নক্ষত্রের মতো সন্তান-
আর জন্ম দেয় না।
হয়তো দেয়, আমরা সে শিশুকে ধ্বংস করে দিচ্ছি
ব্যর্থতার স্পর্শে।
আমাদের ব্যর্থ পুরুষরাই বা কি করেছে?
নিরাপত্তার নামে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করেছে,
তৈরি করেছে প্রাণহীন হাজারো শহর।

আমরা আজ চরম ব্যর্থ! চরম ব্যর্থ!
আমরা প্রযুক্তিগত উন্নতি করেছি ঠিকই
কিন্তু নিজের আত্মাকে এবং এর শক্তিকে চিনতে পারিনি।
আমরা সভ্যতার নামে-
অসভ্যতার শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি।

চলো যাই নোয়াখালী

মো. সাইফুল ইসলাম

চলো যাই নোয়াখালী এমামের ডাকে-
খবর পৌঁছে দাও যে যেথায় থাকে।
শপথ করেছে যারা,
হৃদয় থাকবে খাঁড়া,
যখন আসবে ডাক, শত কাজ পড়ে থাক,
সাধ্য কাহারো নাই মোরে বেঁধে রাখে।

চলো তারা নোয়াখালী এমামের ডাকে-
আল্লাহর সেনা হতে পণ যারা রাখে।
এমামের চাওয়া সে তো আল্লাহর চাওয়া,
মোমেনের কাজ শুধু সেই সুরে গাওয়া।

এমাম ঘোষণা দেন পূণ্যের ভূমি-
শহীদের রক্তের দামে মহাদামী,
নিজেরে ত্যাগের সেই পণ যদি থাকে-
চলো যাই নোয়াখালী এমামের ডাকে।

দাজ্জালি দাবানলে ছেয়ে আছে ধরণী-
এমামের এই ডাক নূহের সে তরণী।
রক্ষার তরী পেতে কারো যদি দেরি হয়-
জেনে ভেসে যাবে- আসে প্লাবন প্রলয়;

মোমেন জাতির মানে এক দেহ এক প্রাণ,
এক সাথে তুলে ধরে বিজয় নিশান।
সে নিশান ওড়ানোর দামামা যে হাঁকে-
নোয়াখালী চলো সেই এমামের ডাকে।

দিন চলে যায়

মো. সাইদুর রহমান (তানভীন)

দিন চলে যায়, দিন চলে যায়- আসে নতুন দিন;
কারো যে দিন আঁধার কালো, কারো বা রঙিন।

কারো কাটে সুখে দিবস, কারো কাটে শোকে,
কারো গোধূলিটা ভাসে অসীম দুঃখলোকে।

কারো কাছে তুচ্ছ বড়- লক্ষ কোটি টাকা,
কিন্তু তাতেও যায় কি কভু দুঃখ ঢেকে রাখা!

অট্টালিকার মাঝেও ঢোকে কষ্ট-ঘুণের তীর-
ঋণের ভারে বিষ লাগে তার কোটি টাকার নীড়।

কিন্তু কারো ক্ষুদ্র কুটির, চাঁদের হাওয়া পেয়ে-
শান্তি-সুখে, প্রশান্তিতে অনন্তে যায় বয়ে।

বিচিত্র সব সময় আসে- আবার চলে যায়,
হাসি আসে, কান্না আসে- জীবন-বাওয়া নায়।

সুখই থাকুক, দুঃখ থাকুক; সত্যটা একদিন-
মৃত্যু হয়ে আসবে- জানেন রাব্বুল আলামিন।

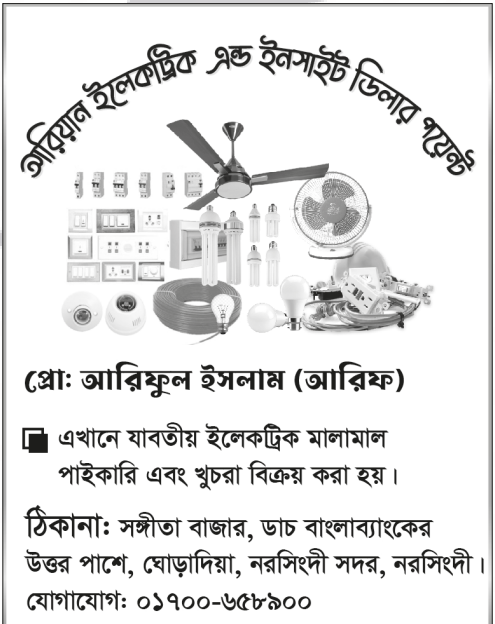

প্রোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ)

এখানে যাবতীয় ইলেকট্রিক মালামাল পাইকারি এবং খুচরা বিক্রয় করা হয়।

ঠিকানাঃ সঙ্গীতা বাজার, ডাচ বাংলাব্যাংকের উত্তর পাশে, ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
যোগাযোগঃ ০১৭০০-৬৫৮৯০০

শিশু ওমর ইবনে ইলিয়াছ (জিহান) এর ১২ তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া কামনা করেছেন বাবা মো. ইলিয়াছ ও মা দিলরুবা আক্তার রুনা। ওমর ইবনে ইলিয়াস ২০১০ সালের ৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে।

দরজা

-ডা. শাহীন মাহমুদ

(১)

জাহেদার মন খারাপ। খোলা দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। বাইরে সন্ধ্যার মৃদু হাওয়ায় অলসভাবে নড়তে থাকা নারকেল পাতার দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে নিজের মনেই ভাবছে- বিয়েটাতে কী কোনো গণ্ডগোল আছে! বিয়েটা করে কী সে ভুল করেছে!

দরজাটিতে বোধহয় ঝি ঝি পোকা আবাস গেড়েছে। নিরিবিলি পেয়ে একটানা শব্দ করে যাচ্ছে। জাহেদার চিন্তার সাথে নেপথ্য সঙ্গীতের মতো সে সেই শব্দটি তাল দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সুবিধা হবে ভেবেই তো সে বিয়েটা করেছিল! কিন্তু সুবিধা কী আদতেও হচ্ছে! ইউসুফের সাথে ইদানীং খিটির-মিটির লেগেই আছে। কীসের থেকে কী হয়, দুজনেরই মেজাজ খারাপ হয়, খুট-খাট ঝগড়া চলছে তো চলছেই দিনের পর দিন। এভাবে দীনের সংগ্রামে কোন অগ্রগতিটা হবে? ঘরের সংগ্রামেই তো জেরবার অবস্থা!

দীনের ব্যাপারে জাহেদা অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ ও রাসুলের (সা.) প্রতি ভালোবাসায় তার কোনো কমতি নেই। কিন্তু স্বামী মোজাহেদ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি কী ভালোবাসার কমতি দেখা যাচ্ছে? নয়তো এরকমটা কেন হচ্ছে! সে তো তার স্বামীর জান্নাতের দরজা হবার প্রতিজ্ঞাতেই অনঢ়। দীনের কাজে বাঁধা তো দেয়ই না, সে চিন্তাও মনে কখনো উঁকি দেয়নি। নিজেও আন্দোলনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। নাহ, তাকে হয়তো দীনের ব্যাপারে আরো কঠোরই হতে হবে- মোমেনের সংসারে তাহলেই হয়তো শান্তি চলে আসবে- এলোমেলো জিজ্ঞাসার উত্তরে অবশেষে সিদ্ধান্তে আসে জাহেদা।

দরজায় ছায়া পড়তেই খুট করে চিন্তার সুতোটা কেটে যায় জাহেদার। ইউসুফ এসেছে। সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ ইউসুফের চোখে মুখে। ছোটোখাটো ব্যবসা করে টেনেটুনে সংসারটি চালায় ইউসুফ। এই টানাটানি করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয় তাকে। ব্যবসার কাজ শেষ করেই ছুটতে হয় আন্দোলনের কাজে। সবশেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাতই হয়ে যায়। আজকে শরীরটা বেজুত থাকায় ছুটি নিয়ে সন্ধ্যায়ই এসে পড়েছে সে।

আজকে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লা! কিছুটা বিস্ময় নিয়েই জিজ্ঞাসা করে জাহেদা।

শরীর জুত লাগতেছে না। খাবার মতো কী আছে? মৃদু স্বরে বলে ইউসুফ।

খাবার রানবো কী করে? তোমার না বাজার করে নিয়ে আসার কথা? আনলে তো রেঁধে দিবো? নিজেও ক্ষুধায় কাতর জাহেদা ইউসুফের খালি হাতের দিকে তাকিয়ে মৃদু গজ গজ করতে করতে বলে কথাগুলো।

ইউসুফ আর কিছু না বলে, অজু করে সালাহ কায়েম করে- চটপট শুয়ে পড়ে। ও জানে বাসায় মুড়ি আছে, খেলে খাওয়া যায়। কিন্তু দুপুরে না খাওয়া জাহেদাকে এবার মুড়ি ভর্তা করতে বললে সেই মৃদু গজগজানি মুহূর্তেই গর্জনে রূপান্তর হতে পারে। দু'টো কথা তখন চারটা কথার রূপ নেবে; সেই ভয়ে, চুপচাপ থাকাই শ্রেয় মনে করে শুয়ে পড়ে সে।

এই সন্ধ্যার সময় শুইতেছ কেন? বাজারে যাবা না? খাইতে না চাইলা? দরজা থেকেই কিছুটা রাগতস্বরে বলে জাহেদা।

যাবো, পরে। একটু ঘুমিয়ে নিই। আজকে রাত ১০টায় আমির মিটিং ডেকেছেন, সেখানে যেতে হবে। বাজারে একটু দেরিই হবে- বিড় বিড় করে, ভয়ে ভয়ে ইউসুফের প্রত্যুত্তর।

এইটাই তো তোমার কাম। সুযোগ পাইলেই শুয়ে থাকো। কত রাজ্যের পরিশ্রমই যে তুমি দেখাও! তুমি পরিশ্রম করো, আমি করি না? তুমি দীনের কাজ করো, আমি কি বসে থাকি? তুমি কখন বাজারে যাবা, এর জন্য এখন আমার বইস্যা থাকতে হবো? তুমি তো বাজার দিয়াই খালাস.....এরকম ধারাবাহিক এক বাক্যধারার তুবড়ি চলতে থাকে জাহেদার মুখে। তবে মেজাজ যত খারাপই হোক, জাহেদার মনে আছে এশার আযান দিলে সালাহর জন্য স্বামীকে অবশ্যই জাগিয়ে দিতে হবে। দুনিয়াতে যা কষ্ট করছে তো করছে, জান্নাতের দরজা হওয়াটা সে কোনোভাবেই মিস করতে রাজি না।

(২)

ইউসুফের শরীর অসুস্থ থাকায়- এই বকবকানির মধ্যেও সে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাহেদা তাতেও ভীষণ বিরক্ত। তার কথাগুলোর কোনো মূল্যই ইউসুফের কাছে নাই। একজন মোমেন-মোজাহেদ কি তার স্ত্রীকে এতটা অবহেলা করতে পারে? স্বামীর কাছে নিজের দুঃখের কথা, মনের কথা বলবে না তো- বলবে কার কাছে!

তিক্ত-বিরক্ত মুখেই জাহেদা দুয়ার ছেড়ে উঠলো। পাশের ঘরেই শরীফা ও সুজন থাকে। শরীফার এক ছেলে, সোহাগ। দুনিয়ার দুরন্ত। জাহেদার মনে হয় ছেলেটার মানসিক সমস্যা আছে। অটিজম না কী যেন বলে, এইরকম কিছু একটা। বোধবুদ্ধি কম, খালি দৌড়ের উপর থাকে। অত্যাধিক নড়াচড়া করে, কোনোভাবেই স্থির থাকবে না। এই বাচ্চাটাকে নিয়ে শরীফার হয়েছে এক জ্বালা। সারাদিন ঘরের কাজ, দীনের দায়িত্ব ও কাজ ছাড়াও সর্বক্ষণ এই ছেলেকে সামলানো। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হয়। সবসময় এত হন্তদন্ত হয়ে থাকায়- মেজাজও মাঝে মাঝে তেড়াব্যাঁকা হয়ে থাকে। যখন মেজাজ বেশি খারাপ হয়, তখন ওর সামনে গেলে খবর আছে। গুপ মেরে বসে থাকবে। দশটা কথা বললে একটা রা' করবে না। জাহেদার অবশ্য এটা সয়ে গেছে। শরীফা যে আসলে এভাবেই ওর সাথে নিজের কষ্টটা শেয়ার করে- এটা সে এতদিনে বুঝে গেছে। শরীফার এই মেজাজ কিন্তু সুজনের সামনে কখনোই দেখায় না। হয়তো কিছুটা আপন বলে অনুভব করে, কিছুটা বোনের মতো ভাবে বলেই ওর সাথে নিজের সেই কষ্টটা, সেই অভিমানটা এভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু জাহেদা জানে, শরীফা মানুষটা খুব মায়ার। তাদেরও অভাবের সংসার। তারপরও জাহেদাদের খোঁজ খবর রাখে, সুযোগ পেলেই এটা ওটা দিয়ে সহযোগিতা করে।

শরীফা, বসে আছো? শরীফার ঘরের দরজা ধরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করে জাহেদা। দরজাটাতে হাত রাখতেই একটু ক্যাঁচ করে উঠে। কিছু একটা হয়তো ঢিলে হয়ে আছে, নড়বড়ে লাগছে।

শরীফা বসেই ছিলো এসময় সুজনের অপেক্ষায়। সুজনের আসার সময় হয়ে এসেছে। প্রতিদিন এই সময়ই বাসায় ফেরে সুজন। সারাদিনের দুরন্তপনার পরে বাচ্চাটাও এই সন্ধ্যার সময়ই ঘুমায়। অবশ্য তার জন্য শরীফাকে কসরৎ-ও খুব কম করতে হয়নি। সুজনের বাসায় আসার সময়টুকুতে যেন ঘরটা একটু ঠাণ্ডা থাকে- এজন্য দিনের পর দিন শরীফা সোহাগকে সন্ধ্যার সময় ঘুম আনানোর সাধনা করেছে। সাধনায় সে সিদ্ধিলাভও করেছে। তার প্রমাণ, বিছানার প্রতিটি কোণার দিকে হাত-পা তাক করে অকাতরে ঘুমাচ্ছে সোহাগ। এখন দেখলে কে বলবে- এই খুদেটির এত তেজ!

সুজন আসবে, ওর অপেক্ষা করছি- শরীফা শান্তস্বরেই বলে। অবশ্য তোমার ওখানেই যাবো যাবো করছিলাম- একটু থেমে যোগ করে শরীফা।

আমাদের ওখানে যাবে! সুজন ভাইয়ের আসার সময় তো তুমি কোথাও যাও না? কোনো সমস্যা! বিস্ময় মাখানো শঙ্কা নিয়ে জিজ্ঞেস করে জাহেদা।

না.. মানে.. আসলে.. বাসায় কিছু নেই। সুজন তো আমীরের ওখান থেকে সরাসরি বাসায় আসে। আসার সাথে সাথে বাজারে পাঠাই কেমনে? সারাদিন পরে কি খেতে দেবো সেটাই ভাবছি! বহু ইতস্তত করতে করতে অজুহাতের সুরে বলতে থাকে শরীফা।

আজকে তো আবার মিটিং আছে। তারমানে বাজারেও দেরি হবে। ভাবছিলাম, তোমার ওখান থেকে কিছু এনে দিই - লাজুক মুখে যোগ করে।

পোড়াকপাল! আমার বাসায়ও তো কিছু নেই! মুড়ি আছে, দুপুরে আমি তাই-ই খেয়ে নিয়েছি। ইউসুফ তো এসেই শুয়ে পড়লো! স্তিমিত স্বরে বলে জাহেদা।

এই ভরা সন্ধ্যায় শুয়েছে ইউসুফ ভাই! শরীফার বিস্ময়।

না, ওর নাকি শরীরটা ঠিক জুতের নয়- নিরাসক্ত কণ্ঠে জাহেদার মন্তব্য।

কিছু খেয়েছে? তোমার বাসায়ও তো কিছু নেই বললে! শরীফা চিন্তান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

নাহ, উঠে বাজারে যাবে। তারপর তো রান্নাবান্না। একইভাবে উত্তর দেয় জাহেদা।

ঘটনাটা নতুন কিছু নয়। টানাটানির সংসার, টানাটানির বাজার, টানাটানির উপার্জন। তাদের সক্ষমতার বড় অংশটাই তারা দান করেছে আল্লাহর রাস্তায়, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। দিন আনি- দিন খাইয়ের এই সংসারগুলোতে এই দৃশ্য তাদের অতি পরিচিত। দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যায়।

তোমার মুড়িগুলো নিয়ে আসো তো! নিরবতা ভাঙ্গে শরীফা।

জাহেদা শরীফার মতলব জানে না। জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও মনে করে না। দ্বিরুক্তি না করে মুড়ির টিন নিয়ে আসে চট করে।

যে মুড়ি আছে, দু'জনের চলে যাবে- শরীফা টিনের দিকে তাকিয়ে বলে।

ধুর, দুপুরে আমি খেয়েছি। এখন আর খেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি খাও। জাহেদা আন্তরিকভাবেই উত্তর দেয়।

আরে! আমি আমাদের খাবার কথা বলছি নাকি। বলছি, ইউসুফ আর সুজন খেতে পারবে- হাসতে হাসতে জানায় জাহেদা। তুমি আর সুজনকে কিছু বলো না। চলো, আলুর দম করে ফেলি- শেষে যোগ করে।

আলু তো আমার বাসায়ও আছে! কিছুটা অবাক হয়ে বলে জাহেদা।

ওগুলো থাক। ধরে নাও, আজকে একটু দুজনে মিলে একটা পিকনিকই হচ্ছে। হাসির রেশ ধরে রেখেই শরীফা বলতে থাকে।

জাহেদা শরীফার পরিকল্পনা ধীরে সুস্থে বুঝতে পারে। আসলে ওরা দু'জন মিটিংয়ে এটেন্ড করবে বলে কিছু একটা মুখের সামনে ধরতে চাচ্ছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে দু'জনেই তো ক্ষুধার্ত থাকবে। এতে জাহেদারই আর আপত্তি করার কী আছে!

শরীফা আলুর দম করতে থাকে। সাথে টুকটাক গল্পও চলতে থাকে। নিত্যদিনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সাধারণ মেয়েলি গল্প। সেই গল্পগুজবের মাঝেও জাহেদার মনে ভাবনাটা দোলা দিয়ে যায়- ক্ষুধায় মেজাজটা খিঁচরে না থাকলে এই বুদ্ধিটা তার মাথায়ও আসতো! কষ্ট করে দুপুরে কষা মুড়িও খেতে হতো না, ইউসুফও শোয়ার আগে কিছু খেতে পারতো। ওর শরীরটা বেজুত আছে বলছিলো!

শোনো, বাসায় কিছু নেই- এটা সুজনকে আর বলার দরকার নাই। সারাদিন পরে বাসায় আসবে, ইনকাম-পাতি হইছে কিনা দেখে- খাওয়া দাওয়ার পরে মিটিঙে যাওয়ার সময় বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দিলেই হবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পরে এসেই অভাব-অভিযোগ নিয়ে বসতে কারোরই ভালো লাগবে না। শরীফার কথাগুলোতে চিন্তার চটকাটা ভাঙ্গে জাহেদার।

যদি আজকে উপার্জন না হয়! কৌতূহলী হয়ে জানতে চায় জাহেদা।

তাহলে বাজারের কথা আরো পরে বলবো, রাতে। আল্লাহ যেভাবে এখন চালাচ্ছেন- কোনো একটা বন্দোবস্ত হয়েই যাবে। আর যদি নাও হয়- মাঝখান থেকে মিটিঙের আগে এসব নিয়ে কথা বললে- ও দুশ্চিন্তা করতে থাকবে। বউ বাচ্চার কালো মুখ তো আর মনে শান্তি এনে দেবে না। ওভাবে ঘর থেকে বের হলে- মনোযোগ আর মিটিঙে থাকবে কীভাবে! আমীরের কথাই বা মনোযোগ দিয়ে শুনবে কীভাবে! অযথা দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া। ওখানে বসে দুশ্চিন্তা করলে তো আর টাকা আয় হবে না। স্মিতহাসিযুক্ত মুখে, মৃদু অথচ দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধীরে ধীরে টানা বলে যায় শরীফা, হয়তো কিছুটা স্বগোতোক্তিই করতে থাকে। আজকে যদি উপার্জন নাও হয়- সুজন ভালো থাকলে, সুস্থ থাকলে, ওর মন ভালো থাকলে, কালকে সেটা হবে ইনশাআল্লাহ। একরাত না খেলে তো আর কেউ মরে না। কিন্তু ওর মন খারাপ থাকলে, ও খারাপ থাকলে- সব কিছুই নষ্ট হতে থাকবে- সেটা হোক দীন, হোক দুনিয়া।

জাহেদা কিছুটা চিন্তিত, কিছুটা বিহ্বল, কিছুটা বিস্মিত হয়ে ভাবে- শরীফার চেয়ে কী জাহেদার ক্ষুধা বেশি লাগে! বয়স তো তাদের দু'জনের একই। বরং বাচ্চার ধকলে শরীফারই স্বাস্থ্য কিছুটা কাহিল। তাহলে ওর মেজাজ খারাপ হয় না! হিসাবটা মেলাতে পারে না ঠিকমতো।

আলুর দম রান্না হয়ে গেছে। কিছু মুড়ি নিজে রেখে, অন্য একটা বাটিতে আলুর দম ঢেলে যখন জাহেদার হাতে দেয় শরীফা- তখন মসজিদ থেকে এশার আযান ভেসে আসছে।

যাই, ইউসুফকে ডেকে দিই গিয়ে। আযান হচ্ছে, সালাহ কায়েম করুক উঠে। শরীফা কিছুটা ব্যস্ততার সাথেই চলে যেতে উদ্যত হয়।

এখন ডেকো না। ইউসুফ ভাইয়ের শরীরটা ভালো না, বললে না? মিটিং তো রাত দশটায়। তার আগে এমনিতেই উঠে যাবে। তখন খেতে দিয়ো- শান্তস্বরে উপদেশ দেয় শরীফা। তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করে- আর গিয়ে ওর পকেটটা চেক করে দেখো তো আজকে উপার্জন-পাতি হয়েছে কিনা! পুরুষ মানুষের উপার্জন না থাকলে কিন্তু শরীর খারাপ হয়! আজকে আয় না থাকলে, আমাকে জানিয়ো। দেখি সুজনের কী অবস্থা! রাতে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘাড় কাত করে সম্মতি দেয় জাহেদা। তার মনে একটা এলোমেলো চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। কী একটা যেন বোঝা দরকার কিন্তু ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছে না!

দরজাটা দিয়ে বের হবার সময় আবারও শরীফাদের দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল। আর ঠিক তখনই ওর মনে পড়ল জিজ্ঞাসাটা- শরীফা, তুমি দুপুরে কিছু খেয়েছো? তোমার ঘরে তো মুড়িও ছিলো না!

উত্তরে শরীফার মুখে কেবল একটা স্মিত হাসি দেখতে পায় জাহেদা।

ওর নিজের ঘরের দরজা থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকটা শুনতে পাচ্ছে। ডাকটা এখন কানে বেশ লাগছে। সমস্ত ভাবনা ছাপিয়ে মনে প্রশ্ন উঠে আসে- দরজাটা কি মেরামত করতে হবে!

বিগত সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

সম্পাদনা: শামিমা আক্তার

বি. দ্র.- আখবারে তওহীদের বিগত সংখ্যা পড়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন বহু পাঠক। তাদের সবার চিঠি প্রকাশ করা গেল না বলে দুঃখিত।

'আখবারে তওহীদ' বরাবরই হেযবুত তওহীদের ভাই ও বোনদের কাছে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত একটি পত্রিকা। পূর্বে 'আখবারে তওহীদ' ট্যাবলয়েড আকারে ছাপা হলেও এবার এটি 'সংকলন'-এর আকারে ছাপা হয়েছে যা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তবে পত্রিকাটি পড়ার সময় সূচিপত্রের অভাব বোধ করেছি।

দেশব্যাপী হেযবুত তওহীদের কার্যক্রম, ভাইবোনদের কিছু স্মৃতিচারণ, কিছু অনুভূতি, নারীদের নিয়ে লেখা আর্টিকেল, মাননীয় এমামের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বর্তমান পরিস্থিতি ও মহামান্য এমামুয্‌যামানকে নিয়ে আম্মাজানের লেখা আরও কতো কি ছিল পত্রিকায়! সবই আমাকে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিতে অভিভূত করেছে।

একজন শিক্ষার্থী হিসেবে নোয়াখালীতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আমার আগ্রহ বরাবরই একটু বেশি। আমি প্রথম থেকেই এই বিয়য়ে খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করে আসছি। 'আখবারে তওহীদ' পত্রিকায় মোস্তাফিজুর রহমান শিহাব স্যারের লেখা 'হোস্টেলের দিনরাত্রি' আর্টিকেলটি আমার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত উপহারের মতো লেগেছে। স্যারের লিখনশৈলী নিয়ে কিছু বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আর্টিকেলটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হবে এ তথ্যটি পরবর্তী সংখ্যা হাতে পাওয়ার জন্য আমাকে অধীর আগ্রহী করে তুলেছে। এরকম হৃদয়গ্রাহী বিষয় নিয়ে আখবারে তওহীদে আরো কিছু ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমে পাঠক হৃদয়ে অপেক্ষা সৃষ্টি করলে মন্দ হতো না।

বাবা মোকসেদ আলীর কাছে শুনেছিলাম 'আখবারে তওহীদ' প্রথমবার ছাপা নিয়ে তার অনুভূতির কথা। তখন নাকি মোজাহেদরা অনেক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। আমার মতো নতুন প্রজন্মের মোজাহেদদের মধ্যেও এখন একই রকম অপেক্ষা ও অধীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বিগত সংখ্যাটি পড়ে। আমি মনে করি এখানেই 'আখবারে তওহীদ' এর সার্থকতা।

মানার বিনতে মোকসেদ, নরসিংদী

'আখবারে তওহীদ' সম্পূর্ণ পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। বিশেষ করে নারীদের নিয়ে লিখা আর্টিকেলগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। প্রতিটি আর্টিকেল ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এছাড়া 'হোস্টেলের দিনরাত্রি' আর্টিকেলটি দারুণ লেগেছে। পত্রিকাটি পড়ে আমি সারাদেশের হেযবুত তওহীদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তবে পত্রিকার কগজের মানটা যদি আরেকটু উন্নত করা যায় তবে ভাল হত। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই যে 'আখবারে তওহীদ' আমরা আবারও হাতে পেয়েছি।

মাহমুদা আক্তার দীপা, নারায়ণগঞ্জ

'আখবারে তওহীদ' পড়ে মহামান্য এমামুয্‌যামানের বিভিন্ন শখ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং কীভাবে নিউজ তৈরি করতে হয় সেটাও বুঝতে পেরেছি। কামাল প্রধান আমিরের আর্টিকেলটি পড়ে একটা বিষয় বুঝতে পারলাম কীভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনলাইন বালাগকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি। এছাড়া ভাইবোনদের উপর হওয়া নির্যাতনের কাহিনী আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

নুসরাত জাহান, হবিগঞ্জ

কুইজ

১. রসুলাল্লাহর সময় মদীনায় কোন কোন ইহুদি গোত্র বসবাস করত?

২. তালেবানরা কোন কোন সালে আফগানিস্তানে সরকার গঠন করে?

৩. কামাল আতাতুর্ক কোন কাজের জন্য বিখ্যাত?

৪. আখবারে এসলামীয়া পত্রিকার সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?

৫. প্রথম ক্রুসেডের কারণ কী ছিল?

শিল্প বাণিজ্য

সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের মাঝে কে আর ফ্যাশন!

জিনাত ফেরদাউস

হেযবুত তওহীদের ক্ষুদ্র অনলাইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কে আর ফ্যাশন স্বপ্ন দেখছে দেশীয় ফ্যাশন মার্কেটে নিজেদের ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠা করতে। শক্তিশালী করে তুলতে চাচ্ছে হেযবুত তওহীদের অর্থনীতি। সম্প্রতি দেশজুড়ে ডিলার নিয়োগের কারণে হেযবুত তওহীদের বহু সদস্য-সদস্যা পেয়েছেন নতুন কর্মসংস্থান। যে কোনো উদ্যোগের শুরুটা খুব কঠিন হয়। কে আর ফ্যাশনের কঠিন সময়টি কীভাবে সামলাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান মনির জানার জন্য তার সঙ্গে কথা বলেন প্রতিবেদক জিনাত ফেরদাউস।

কে আর ফ্যাশনের ভবিষ্যৎ কী? জনাব মনির বলেন, 'কে আর ফ্যাশন একটি লাভজনক এবং উন্নয়নমূলক খাত। মাননীয় এমামের ঘোষিত বাণিজ্য নীতি- আন্দোলনের সদস্যদের অর্থ বাইরে যাবে না, বাইরের অর্থ ভিতরে আনতে হবে - এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কে আর ফ্যাশন এগিয়ে চলছে। আমরা মনে করি কে আর ফ্যাশন থেকে যে লভ্যাংশ আসবে তা দিয়ে আন্দোলনের অর্ধেক কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব।'

এবারের ঈদুল আযহায় কে আর ফ্যাশনের লক্ষ্যমাত্রা কতটা অর্জিত হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'গত ঈদুল ফিতরে আমরা খুব অল্প সময় কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতেও আমরা মাননীয় এমামের হাতে ৪ লক্ষ টাকা তুলে দিতে পেরেছিলাম। তখন থেকেই আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম ঈদুল আযহা নিয়ে। তবে আমরা আশানুরূপ ফলাফল পাইনি। ঈদে আমাদের ৩০ লক্ষ টাকার পোশাক বিক্রির পরিকল্পনা ছিল কিন্তু বিক্রি হয়েছে মাত্র ১১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার পোশাক।'

আশানুরূপ ফল না পাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, 'সারা দেশে আমরা এবার ডিলার নিয়োগ দিয়েছি এবং আমি নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ডিলারদের কাছে পোশাকসহ যাবতীয় প্রসাধনী সামগ্রী সরবরাহ করেছি। কিন্তু সবার সহযোগিতা পাচ্ছি না। মাননীয় এমামের গৃহীত বাণিজ্য নীতি এখনও আমাদের সবাই উপলব্ধি করতে পারেন নাই।'

হেযবুত তওহীদের বাণিজ্য নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনাব মনির ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের উদাহরণ টেনে বলেন, 'ব্রিটিশ যুগে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যেত। ফলে আমরা দরিদ্র হয়ে পড়েছিলাম। তখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বলা হয়, আমরা বিদেশি পণ্যের চমকে দেশকে ভুলে না গিয়ে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করব। বিদেশি পণ্য বর্জনের পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান এক নতুন জোয়ার আনে। স্বদেশী তাঁত, বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, কাগজ, চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্তে বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিল্প-কলকারখানা স্থাপিত হয়। যে কোনো জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সূত্র এখানেই। আমাদের দেশের টাকা বিদেশে পাচার হলে দেশের কোনো উপকারে আসে না। অর্থশালীরা যদি দেশে বিনিয়োগ করেন তাহলে দেশের মানুষের কর্মসংস্থান হয়, দেশ লাভবান হয়। এই সূত্র হেযবুত তওহীদ নামের ক্ষুদ্র এই জাতির জন্যও প্রযোজ্য। আমরা যদি চলমান সংকট মোকাবেলা করে টিকে থাকতে চাই তাহলে আমাদেরকে জাতীয়তাবোধের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রজনীকান্ত সেন গান লিখেছিলেন, 'পরের জিনিস কিনব না যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই'। মা বলতে তিনি দেশমাতাকে বুঝিয়েছেন। আমাদেরও এখন নীতি হওয়া উচিত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিয়ে ব্যবহার করা।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা হেযবুত তওহীদ সারা পৃথিবীতে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি তা পূরণ করার জন্য আমাদের মধ্যে কঠিন জাতীয়তাবোধ তৈরি করতে হবে, আমাদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা পোশাক। যখন কেউ কে আর ফ্যাশন থেকে পোশাক কিনে তখন এর লাভের একটি অংশ আন্দোলনের কাজে ব্যয় হয়। বাইরে থেকে পোশাক কিনলে সেটা দিয়ে আন্দোলনের কোনো উপকার হয় না। আমাদের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। নিজেদের পণ্য কিনলে আমাদের অর্থ আমাদের মধ্যেই থাকবে, আমাদের অনেক সদস্যের বেকারত্ব দূর হবে, যত উন্নয়ন প্রকল্প মাননীয় এমাম নিয়েছেন সেগুলোর কাজও এগিয়ে নেওয়া যাবে। জাতীয় উন্নতি নিয়ে এই চিন্তাটাই হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। আমাদের এই বোধটা সবার মধ্যে আসছে না। সংকীর্ণ চিন্তা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করি, সবাইকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব পালন করতে হবে আমিরদেরকে। তারা যদি সদস্যদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন, আকিদা পরিষ্কার করে দেন তাহলেই সম্ভব আশানুরূপ ফল পাওয়া। এই মুহূর্তে কে আর ফ্যাশনের সামনে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমিরদের আন্তরিক সহোযোগিতার মাধ্যমে কে আর ফ্যাশন অচিরেই বাংলাদেশের পোশাক জগতে জায়গা করে নিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

কে আর ফ্যাশনের পোশাকের ব্যাপারে ভোক্তাদের অনুভূতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বেশিরভাগ মন্তব্যই ভালো। আমাদের তৈরিকৃত পোশাকগুলো বিশেষ করে পাঞ্জাবি সবাই খুব পছন্দ করেছে। তবে এটাও মানতে হবে, এখনও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। শেখার কোনো শেষ নেই। বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতার ক্রেতারা যেন আমাদের কাছ থেকে পছন্দের পণ্য ক্রয় করতে পারেন সেজন্য পণ্য তৈরি ও বৈচিত্র্যময় কালেকশনের বিষয়টি গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমরা চাই সবাইকে নিয়ে চলতে।'

সম্প্রতি মাননীয় এমামের একটি বক্তব্যের রেশ টেনে বলেন, 'চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এমন সময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজি হারানোর ঝুঁকিতে আছে। শুধু বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোই টিকে থাকতে পারবে। ইতোমধ্যেই তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হেযবুত তওহীদের কে আর ফ্যাশনকেও এই ঝুঁকি মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। পুঁজি হারানো যাবে না, ক্ষতির মুখেও পড়া যাবে না। সেজন্য হেযবুত তওহীদের সকল সদস্য-সদস্যা ও আমিরদের সহযোগিতা লাগবে।'

নারী উদ্যোক্তা ফাতেমা রুহি

আদিবা ইসলাম

২০১০ সালে নিজস্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা থেকে মাত্র তিনহাজার টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু হয় হেযবুত তওহীদের উত্তরা শাখার মোজাহেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা রুহির ফেসবুক বিজনেস পেজ Women Trendy Target এর পথচলা। ১২ বছরের দীর্ঘ জার্নির পর এখন তার হাত ধরেই তার প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক লেনদেন হয় কোটি টাকার বেশি। কীভাবে তিনি এই অনলাইন বিজনেস দাঁড় করালেন আখবারে তওহীদের পাঠকের সামনে সে বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন।

উম্মুল খায়ের ফাতেমা রুহি

তিনি বলেন, ২০১০ সালে ব্যক্তিগত কারণে কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই পোশাকের ব্যবসা শুরু করি। শুরুতে মাত্র ১০টি পোশাক নিয়ে কাজ শুরু করি। তখন পুঁজি ছিল মাত্র তিনহাজার টাকা। প্রাথমিক অবস্থায়, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় ভালো সাড়া পাই। তাই বিজনেসের পরিসর বড় করতে বড় বাজেটের ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিন্তু তখন আমি ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। এটার সমাধান ছাড়া আমি ব্যবসা দাঁড় করাতে পারছিলাম না। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকজন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুর সহযোগিতায় আমি ফিন্যান্সিং সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিজনেসে কয়েক লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে সক্ষম হই।

যেহেতু আমার পুরো বিজনেসটাই ছিল অনলাইনকেন্দ্রিক। তাই ব্যক্তিগত পরিচিতদের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আমার বিজনেস অনলাইন মার্কেটপ্লেসে পরিচিত হতে থাকে। অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় আমাকে টেকনিক্যাল সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে সেগুলোর সমাধান করতে গিয়ে আমাকে নতুন করে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রটি অনেক প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ায় এখানে সবসময় একটা গবেষণার মধ্যে থাকতে হয়। কাস্টোমারের চাহিদা অনুযায়ী, নিত্য নতুন ট্রেন্ড অনুযায়ী সবসময়ই পোশাকে নতুনত্ব আনতে হয়।

তিনি বলেন, অনেকে ভাবতে পারেন অনলাইন বিজনেস পরিচালনা হয়ত সাধারণ বিজনেসের তুলনায় সহজ। কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা। কেননা অনলাইন বিজনেসের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় দিতে হয়। অনলাইনে এক্টিভ থাকতে হয়। এই প্লাটফর্মে কাজটা যেমন খুব সহজ নয়, তেমনি খুব কঠিনও নয়। আমরা যারা আন্দোলনের কাজ করি আমাদের জন্য অনলাইন বিজনেস প্লাটফর্মটা খুবই উপযোগী। কেননা বাহিরে যদি আমার কোন জব থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় দিতে হবে। এতে আন্দোলনের কোনো কাজ পড়লে করা মুশকিল হয়। কিন্তু অনলাইন বিজনেস আমাদের আন্দোলনের কাজের পাশাপাশিই ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্টের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি বলেন, এখন আমার বিজনেস প্রতিষ্ঠানে বাৎসারিক কোটি টাকার লেনদেন হয় আলহামদুলিল্লাহ। এই বিজনেস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমার নিজের সচ্ছলতার পাশাপাশি আন্দোলনের অর্থনৈতিক ফান্ডের ক্ষেত্রে আমি ভূমিকা রাখতে পারছি। ভবিষ্যতে যেন তার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠে এবং আন্দোলনের প্রতিটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অবদান রাখতে পারে তার জন্য তিনি আন্দোলনের সকল ভাইবোনদের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

পেজ লিংক - https://www.facebook.com/womenstrendytargets/

ওয়েবসাইট লিংক - https://bdtrendytarget.com/

আত্মরক্ষা সবার নাগরিক অধিকার

আত্মরক্ষার কথা আসলে সবার কাছেই এই প্রশ্ন ধরা দেয় কুংফু না কারাতে, কোনটি শিখলে আপনি সঠিকভাবে আত্মরক্ষা শিখতে পারবেন?

প্রথম কথা হলো দুটিই মার্শাল আর্ট, যা আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। যারা আমার আগের লেখাটি পড়েছেন তারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, কোনটি শিখলে আপনি আত্মরক্ষা করার যথাযথ কৌশল আয়ত্ব করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে আগে জানতে হবে কুংফু এবং কারাতের মধ্যে পার্থক্য কি?

কারাতের উৎপত্তি বা অতীত ইতিহাস নিয়ে খুব স্পষ্ট কিছু না বলা গেলেও এটা নিশ্চিত যে এর উৎপত্তি হয়েছে হাজার বছরেরও আগে। কারাতে শব্দটা জাপানি, এর অর্থ "খালি হাত"। কারাতে হলো- খালি হাতে এক ধরনের 'মার্শাল আর্ট' বা মল্লযুদ্ধ। যে মল্লযুদ্ধের উদ্ভবের পিছনে একজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কারাতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর বিচিত্র কলা-কৌশলের কারণেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে, কুংফু হলো চীনা শব্দ। এই শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয় কোনো অধ্যয়ন, শিক্ষা অথবা অনুশীলন। যেটির জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, শক্তি। সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলের মতে, চীনের শাওলিন টেম্পল মন্দির শুধুমাত্র দীর্ঘ ইতিহাস আর বুদ্ধ ধর্মের বিকাশের জন্যই বিখ্যাত নয়। এর সবচেয়ে বড় খ্যাতি মার্শাল আর্ট কুংফুর জন্য।

কুংফুতে লাঠি, তরবারি, চেইন স্টিক সহ বিভিন্ন অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কুংফুর কৌশল আর ভঙ্গিগুলো ধার করা হয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তুর আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার নানা ভঙ্গিমা থেকে। বাঘ, ঈগল, সাপ, ভালুক, নেকড়ে, ড্রাগন ইত্যাদি নানা জীবজন্তু কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে আক্রমণ করে, মুহূর্তের মধ্যে সরে যায় শত্রুর নাগালের বাইরে, কীভাবেই বা ছোটে বিদ্যুৎগতিতে এসব কিছু পর্যবেক্ষণ করে তার ধারণাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে কুংফুতে।

কুংফু নিয়ে বুদ্ধ ধর্মের শাওলিন টেম্পলের দেয়ালে খোদাই করা আছে বুদ্ধ ধর্মের একটি কথা, 'আত্মরক্ষা কর কুমারী মেয়ের মতো, আর আক্রমণ কর বাঘের মতো অর্থাৎ লড়াইয়ে সাহসের পাশাপাশি সতর্কও হতে হয়, না হলে বিপদ অনিবার্য।

আমাদের সমাজের মানুষ কতটুকু নিরাপদভাবে চলাচল করতে পারে? পরিরারের একটা ছেলে বা মেয়ে যদি বাহিরে যায় তাহলে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত চিন্তা কাটে না। এই হলো আমাদের সমাজের বাস্তবচিত্র। আত্মরক্ষার কিছু কৌশল জানা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তাছাড়া একবার এই কৌশল রপ্ত করতে পারলে প্রয়োজনের সময় কাজেও লাগবে। আত্মরক্ষার কিছু কৌশল শিখতে আপনাকে কুংফু বা কারাতে যেকোনো একটি জানলেই হবে। বিষয়টি এমন যে, আপানার প্রয়োজনে আপনার বিদ্যা আপনাকে সব সময় সাহায্য করবে। আপনি হয়তো ১০ জনকে পরাজিত করতে পারবেন না। তবে ১০ জনের থেকে নিজেকে রক্ষার্থে আর আপনাকে অন্য কারো সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, যদি মনোযোগ দিয়ে এই বিদ্যা অর্জন করেন।

- **ইসলামে খেলাধুলার গুরুত্ব:**

ইসলাম শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। মো'মেন-মো'মেনাগণকে এতটুকু শারীরিক সামর্থ্য অর্জন করতে বলা হয়েছে, যেন নিজের ও জাতির জন্য প্রয়োজনে আত্মরক্ষা গড়ে তুলতে পারে। অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে থাকা ইসলামে নিন্দনীয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কাছে দুর্বল ঈমানদারের চেয়ে শক্তিশালী ঈমানদার বেশি পছন্দনীয়। যদিও উভয় প্রকার ঈমানদারের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার কল্যাণকর বিষয়াদির প্রতি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য চাও, অক্ষম হয়ো না। (সহিহ মুসলিম,)

রাসুলুল্লাহ (সা.) শরীর গঠনমূলক খেলাকে উৎসাহিত করতেন। আল্লাহর রসুল (স.) স্বয়ং মসজিদে নববীর সামনে খেলাধুলার আয়োজন করতেন, কুস্তি, তীর বা বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে নিজে অংশ নিতেন এবং তাঁর আসহাবদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

মহামান্য এমামুয্যামান নিজেও শরীর গঠনমূলক খেলাকে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি একজন জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ ছিলেন। তিনি মানুষখেকো বাঘসহ বহু হিংস্র প্রাণী শিকার করেছেন। তিনি ফুটবল, কাবাডি খেলতেন। রাইফেল শুটার হিসাবে তিনি বিশ্ব অলিম্পিকে মনোনীত হয়েছিলেন।

আত্মরক্ষাকে মানুষের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং যে তোমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার ওপর আক্রমণ করো, যেরূপ সে তোমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৪)।

আমাদের দেশের আইনেও রয়েছে আত্মরক্ষার বিধান। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৯৬ থেকে ১০৬ ধারায় উল্লেখিত প্রত্যেক নাগরিককে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

মো. আশিক ইকবাল
প্রশিক্ষক ও জাজ- মার্শাল আর্ট, কুশু-কুংফু
তথ্য সংগ্রহ : পত্র পত্রিকা এবং ইন্টারনেট।

কৃ ষি পা তা

গোপালগঞ্জ কৃষি প্রকল্পের ঘামঝরানো দিন

হাসান মাহদী

গোপালগঞ্জের কৃষি প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে আসেন গোপালগঞ্জ উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা।

একটি বৈশ্বিক সংকট যে ধেয়ে আসছে তার ঘোষণা মাননীয় এমাম বিগত দশ বছর যাবৎ দিয়ে যাচ্ছেন। এ সংকট থেকে বাঁচার জন্য তিনি ২০১৭ সনে লালবাগে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে কৃষি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যে স্বনির্ভর হতে হবে। আমাদের আওতায় থাকা এক ইঞ্চি আবাদযোগ্য মাটিও ফেলে রাখা যাবে না। প্রতি ইঞ্চি জমি, প্রতিটি জলাশয়কে উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ২০২০ সনে করোনা ছড়িয়ে পড়লে মাননীয় এমামের সেই কথার গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করতে পারে। তখন সারাদেশের প্রায় ২৪টি জেলায় হেযবুত তওহীদের সদস্যরা কৃষি প্রকল্প আরম্ভ করে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলাও ছিল অন্যতম। জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে মৌলভীপাড়ায় অবস্থিত এই কৃষি প্রকল্প। লোকবলের অভাবে মাঝখানে একবছর এর কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর আবার এ বছর আগস্ট মাস থেকে মোজাহেদদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ৫০০ শতাংশ জমি নিয়ে গড়ে তোলা প্রকল্পটি। প্রকল্পটিতে মৌসুমী সবজি আবাদের সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মোরশেদ খান। এজন্য প্রথমেই আগাছা পরিষ্কার করে জমি প্রস্তুতির জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন শাখা থেকে কয়েকজন তরুণ উদ্যমী সদস্যকে প্রকল্পে নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ঢাকা থেকে ইয়াসিন আলী, বিলাল হোসেন, আখতারুজ্জামান জনি, রিপন, সুজন, সজীব হোসাইন, ময়মনসিংহ থেকে জাকিরুল ইসলাম ও সোহাগ, বরিশাল থেকে যাওয়া আব্দুর রহমান অন্যতম। এছাড়াও ঝালকাঠির জেলা আমির শাফায়েত হোসেন তার পল্লীবিদ্যুতের চাকরি শেষ করে বিকাল বেলা কাজে যোগ দিতেন। গোপালগঞ্জ শাখার সদস্য সংখ্যা কম হলেও তারা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল বিভাগীয় আমির আলামিন সবুজও মোজাহেদদের সঙ্গে কৃষিপ্রকল্পে সময় দেন।

ঢাকার উত্তরা শাখার সদস্য ইয়াসীন আলী গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে তার এই কয়দিনের কৃষিকাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। তারা ৩০ জুলাই গোপালগঞ্জ কৃষি প্রকল্পে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের সম্পাদক আগে থেকেই সেখানে রয়েছেন। কোনো সময়ক্ষেপণ না করে বিকেলেই তারা মাঠে গিয়ে

কাজে যোগদান করেন। পরবর্তী দিনগুলোতে তার তত্ত্বাবধানেই তারা প্রকল্পের কাজগুলো সমাধা করেন। ইয়াসিনের ভাষ্যমতে প্রথম দিনে কৃষিকাজ অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হলেও পরে ধীরে ধীরে তারা সবাই এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন ও সবাই একসাথে কাজ করার আনন্দ পেতে থাকেন। ময়মনসিংহের ভালুকা প্রজেক্টে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাকিরুল ইসলাম গোপালগঞ্জেও সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে সক্ষম হন বলে জানান ইয়াসীন। প্রকল্পের ভিতরে তোলা টিনের দোচালা ঘরটাই তাদের অস্থায়ী নিবাস।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় তারা বিছানা ছাড়তেন। সকাল পাঁচটায় উঠে পড়তেন। সালাহ শেষ করে ছয়টার দিকে মাঠে কাজ শুরু করেন। আটটা পর্যন্ত কাজ করে কাঁচা ছোলা খেয়ে পানি খেতেন। তারপর আবার ১০টা পর্যন্ত কাজ করতেন। এই সময়ের বিরতিতে সকালের খাবার হিসেবে থাকত ভাত আর সবজি ভাজি। এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত একটানা কাজ। মাঝেমধ্যে কখনও স্যালাইন, কখনও লেবুর শরবত দেওয়া হতো ঘামের ফলে তৈরি লবণ ও পানির ঘাটতি পুরনের জন্য। এই সময় মোরশেদ খান হেযবুত তওহীদের কৃষি উদ্যোগের সম্ভাবনা ও সফলতার মূলনীতি নিতে আলোচনা করতেন যা মোজাহেদদের ক্লান্তি নিবারণ করতো, যোগাতো কৃষি নিয়ে বহুদূর পথ চলার প্রেরণা। দুপুর তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত সময় পেতেন খাওয়া দাওয়া, সালাহ কায়েম ও বিশ্রামের জন্য। সিলিন্ডার গ্যাসের চুলায় রান্না করতেন গোপালগঞ্জের সদস্য মানিক। দুপুরে মেন্যুতে থাকত মাছ, মুরগি, নানারকম সবজি, ডাল। হালকা বিশ্রাম নিয়ে আবার সূর্যের আলো নিভে যাওয়া পর্যন্ত চলত কাজ।

কাজ সেরে একসঙ্গে পুকুরে নেমে গোসল করতেন, সাঁতার কাটতেন সবাই। এই সময়টাতে যেন আনন্দমেলায় পরিণত হত পুকুর পাড়। এ পুকুরেই গতবছর ছিল আন্দোলনের মৎস্যপ্রকল্প। সন্ধ্যায় তারা দলবেঁধে এলাকায় বা শহরে ঘুরতে যেতেন, আড্ডা দিতেন। তারপর বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া করে মশারি টাঙিয়ে ঘুম। বেশি রাত করা যাবে না। কারণ সকালেই আবার মাঠে যেতে হবে। ইয়াসিন আলী বলেন, "আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে শৃঙ্খলা ও সময় কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। এত পরিশ্রম করেও আল্লাহর রহমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েনি। আমাদের এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যে আমরা এখন সব কাজই করতে পারব।"

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এ ক'দিন তারা কী কী কাজ করেছেন জানালেন ইয়াসিন। প্রথমে তারা ঝোপঝাড়, ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করেছেন। তারপর পাওয়ার টিলার দিয়ে মাটি কর্ষণ করেছেন। তারপর তৈরি করেছেন বেড ও বেডের মাঝখানে পানি যাওয়ার ড্রেন। তারা বেড থেকে যত্ন করে সব ঘাস বেছে ফেলেন। তারপর জমিতে মেশান জিংক, পটাস, ইউরিয়া ও জৈব সার। বেডগুলোতে অধুনা জনপ্রিয় মালচিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে পুরো বেড প্লাস্টিক শিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কেবল চারাটিকে কেন্দ্র করে প্লাস্টিক শিটে ব্লেড দিয়ে কেটে গোলাকার ছিদ্র করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল এতে আগাছা জন্মে মাটির সার টেনে নিতে পারে না, আগাছা নিড়ানির কাজটিও প্রায় থাকে না। অনেক কম পানিতে সেঁচের কাজ হয়ে যায়। তারপর গরু-ছাগলের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য তারা মাঠের চারপাশে বাঁশের খুঁটি গেড়ে নেট দিয়ে বেড়া তৈরি করেন। কৃষি বিভাগের আমির মোরশেদ খান নিজে গোপালগঞ্জ নতুন বাজার থেকে উন্নতমানের বীজ কিনে আনেন। দুই মাসের মধ্যেই যেন ফসল উত্তোলন শুরু হয় এবং কয়েকমাস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে এবং যেন বছরে দুইবার ফসল উৎপাদন করা যায়, সে চিন্তা থেকে পর্যায়ক্রমে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী সবজির বীজ ও চারা রোপণ করা হয়। ফসলগুলো হচ্ছে শশা, ঢেঁড়স, লাউ, করলা, কুমড়া, পালং শাক, লালশাক, মূলা ইত্যাদি।

মালচিং দেওয়া সম্পন্ন হলে গোপালগঞ্জের জেলা আমির আরিফ মোহাম্মদ আলী আহসান ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেন। তার ফ্রেন্ডলিস্টে থাকা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পোস্টটি দেখে নিজে থেকেই পরদিন প্রকল্প পরিদর্শনে চলে আসনে। তিনি গোপালগঞ্জ শহরে অভিনব মালচিং পদ্ধতির প্রয়োগ দেখে উৎসাহ প্রকাশ করে। মোর্শেদ খান জানান, "কৃষি কর্মকর্তা আমাদেরকে সার, বীজসহ সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আমাদের কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও সম্মানীর ব্যবস্থাও করবেন বলে জানিয়েছেন।" কৃষি কর্মকর্তা আগেও হেযবুত তওহীদের কৃষি প্রকল্পে অনেক সার ও বীজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে জানান মোরশেদ খান।

পাঁচদিনের এই কৃষি উদ্যোগে প্রজেক্টের প্রথম ধাপের কাজ সমাপ্ত হয়। এক মাসের মধ্যে প্রজেক্টসংলগ্ন আরো ২০০ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ শুরু হবে। এখানকার মাটি অনেক ভালো তাই সম্ভাবনাও অনেক বেশি বলে জানান কৃষি সম্পাদক মোরশেদ খান। তিনি বলেন, কৃষির মাধ্যমেই আমরা স্বাবলম্বী ও নিশ্চিন্ত হতে পারি, কারণ বর্তমানে মূল সংকটই হচ্ছে খাদ্যের। সমস্যা হচ্ছে আমরা উৎসাহ নিয়ে শুরু করি কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা হয়ে যায় তখন আমরা প্রকল্প ছেড়ে দেই। এতে আমাদের সর্বনাশ হয়, আমাদের পুঁজি ও সময় নষ্ট হয়, আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো আমাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার কোনো সুফল আমরা পাই না। গোপালগঞ্জের প্রকল্প মাননীয় এমামের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হবে এটা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি ইনশাল্লাহ।"

স্বা স্থ্য পা তা

আমাদের শরীরে স্বাস্থ্যকর ঘুম ও নিদ্রাহীনতার প্রভাব

ডা. মোয়াজ্জেমা লিমা

আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ঘুম অত্যন্ত অপরিহার্য। পর্যাপ্ত ও আরামদায়ক ঘুম আমাদের শরীরকে সক্রিয় ও সতেজ করে তোলে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি আমাদের মস্তিষ্ক তখন স্মৃতি ও তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। শরীরের মধ্যে যে ক্ষতিকর উপাদানগুলো থাকে সেগুলো সরিয়ে ফেলে সব ঠিকঠাক করে যাতে ঘুম থেকে উঠার পরে শরীর আবার ঠিকমত কাজ করতে পারে। স্বাস্থ্যকর ও প্রশান্তিময় ঘুম মানসিক চাপ কমায়, স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও শিশুদের মেধা বিকাশে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সুস্থ মানসিকতা সুরক্ষা করে এবং কর্মোদ্দীপনা বাড়ায়।

সাধারণত স্বাস্থ্যকর ঘুম বলতে প্রতি রাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঘুমকে বোঝানো হয়। ভালো ঘুমের জন্য এর পরিমাণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ- তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো তার গুণগত মান। বয়সভেদে মানুষের দৈনন্দিন ঘুমের চাহিদার তারতম্য হতে পারে। সাধারণত নবজাতক শিশু (৩ মাস পর্যন্ত) ১৪ থেকে ১৭ ঘণ্টা ঘুমায়- যদিও ১১ থেকে ১৩ ঘণ্টাও তার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তবে কোনো ভাবেই তার ঘুমটি ১৯ ঘণ্টার বেশী হওয়া উচিত নয়। শিশু (১-২ বছর বয়স) ১১ থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা, প্রাক স্কুল পর্বে (৩-৫ বছর বয়স) ১০ থেকে ১৩ ঘণ্টা, স্কুল পর্যায়ে (৬-১৩ বছর) ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা, টিন এজ (১৪-১৭ বছর) ৮-১০ ঘণ্টা, প্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ (১৮-২৫ বছর)৭-৯ ঘণ্টা, প্রাপ্ত বয়স্ক (২৬-৬৪) বছর ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা, আরো বয়স্ক (৬৫ বা তার থেকে বেশী) ৭ -৮ ঘণ্টার ঘুম আর্দশ।

কিন্তু ৫ ঘণ্টার কম বা ৯ ঘণ্টার বেশী হওয়া উচিত নয়। ঘুম সার্বজনিন ও শরীরের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকর সেবা হলেও- অনেকেই সাময়িক ও দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকেন অনিদ্রায় বা Insomnia তে। সঠিকভাবে যারা নিয়মিত ঘুমাতে পারেন, তাদের শরীর ও মন অনেক শক্তিশালী ও রোগমুক্ত থাকে। অপরদিকে যারা নিদ্রাহীনতায় দিনের পর দিন ভুগতে থাকেন- তারাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন ঘুম ঠিকঠাক না হওয়ার অনুভূতি। অনেকেই বিছানায় শুয়ে এক ফোঁটা ঘুমের আশায় এপাশ থেকে ওপাশ করতে থাকেন। এভাবে রাত গড়িয়ে যায়, ঘুম আসে না।

বর্তমান সময়ে এই নিদ্রাহীনতা বা ইনসমনিয়ার সমস্যাটি বিভিন্ন বয়সের মানুষের মাঝে দিনকে দিন বেড়েই চলছে। বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন, খাবারে অনিয়ম, রাত জাগা, অনেক সময় ধরে টেলিভিশন অথবা মোবাইল পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকা, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চরম হতাশা, ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যার কারনে তরুণদের মাঝে এই নিদ্রাহীনতার প্রকোপ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ নিদ্রাহীনতায় ভুগতে থাকেন।

নিদ্রাহীনতা মূলত ঘুমের একটি ব্যাধি- যার ফলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, কেউ টানা ১৭ থেকে ১৯ ঘন্টা জেগে থাকলে যে ধরনের প্রভাব পড়ে- অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও মস্তিষ্কে সাধারণত একই প্রকারের প্রভাব পড়ে। অন্য এক গবেষণা মতে, টানা ১১দিন না ঘুমানোর ফলে আচরণ ও কাজে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মনোযোগের ঘাটতি ও শর্ট-টাইম মেমোরি লস (STML) হতে পারে, দৃষ্টিবিভ্রম বা Hallucinations হয়। এমনকি মস্তিষ্ক-বিকৃতি পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

রোগব্যাধি নিয়ে মানুষের উপর যত রকমের গবেষণা হয়েছে, সেখানে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে, কেউ যত কম ঘুমাবে- তার আয়ু তত কমবে। এছাড়াও নিদ্রাহীনতার ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়, কারণে-অকারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়, মনোযোগ কমে যায়, অবসাদ আর ক্লান্তিবোধ গ্রাস করে।

নিদ্রাহীনতা বা ইনসমনিয়া একিউট বা ক্রনিক ধরনের হতে পারে। ২-৩ দিনের নিদ্রাহীনতাকে একিউট, আর সপ্তাহ কিংবা মাস পার হলে ক্রনিক নিদ্রাহীনতা বলা হয়ে তাকে। এর ধরন সাধারণত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির জীবনযাত্রা ও মানসিক অবস্থার গোলযোগের জন্যও নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়। নিদ্রাহীনতা যাতে আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যে

বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে, সেজন্য আগেভাগেই সচেতন হওয়াটা জরুরি।

সাধারণ নিদ্রাহীনতা বা আমাদের জীপন-যাপনের ত্রুটিজনিত নিদ্রাহীনতাকে অল্প কিছু সচেতনতার মাধ্যমেই আমরা জয় করতে পারি। তা করতে, যে সকল বিষয়গুলোতে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে-

১. তেল মশলা জাতীয় খাবার যতটা সম্ভব পরিহার করে সঠিক খাদ্যাভাস বজায় রাখা।
২. ঘুমানোর জায়গা আগে থেকেই পরিপাটি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আরামদায়ক ম্যাট্রেস ও নরম বালিশ বেছে নিতে হবে।
৩. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করতে হবে।
৪. ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই মোবাইল, ফোন, ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বিছানা থেকে দূরে রাখতে হবে।
৫. অনিদ্রার সমস্যা বেশী হলে চা, কফি এবং ক্যাফেইন জাতীয় পানীয় এবং খাদ্যদ্রব্য পরিহার করুন।
৬. ইয়োগা কিংবা মেডিটেশন অনিদ্রা সমস্যার ভাল সমাধান হতে পারে।
৭. প্রতিদিন অল্পবিস্তর ব্যায়াম করুন। প্রতিদিন হালকা অ্যারোবিক ব্যায়াম (জোরে হাঁটা, সাইকেল চালানো, দড়ি-লাফ, দৌড়ানো প্রভৃতি) একটা নির্ভেজাল ঘুম উপহার দিতে পারে।
৮. স্বাভাবিকভাবে রাতে ঘুমাবেন। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর ঘুম রাতের বিশ্রামকে কেড়ে নিতে পারে। দুপুরে ভাত ঘুম যদি নিতেই হয়, তবে সেটি আধা ঘন্টার বেশী নয়।
৯. রাতে শোবার ঘর একেবারে অন্ধকার না হলে অনেকের ঘুম আসে না তাই শোবার ঘরের পরিবেশ অন্ধকার করলে ঘুম আসার সহায়ক হতে পারে।
১০. ঘুম নিয়ে অযথা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। সবসময় মনে রাখতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঘুমের ঔষধ খাবেন না। কেননা এটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে পারে।
১১. ঘুমের সময় অতি-উত্তেজনা, উদ্বেগ, দিবাস্বপ্ন নিয়ে উদ্দীপিত হয়ে যাওয়াকে এড়িয়ে চলুন। শান্ত, সুখকর, সংযমী, সু-স্থির কোনো চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিন।

এই নিয়মগুলো আপনার সাময়িক নিদ্রাহীনতার সমস্যা কিংবা জীবনযাত্রার ত্রুটিজনিত নিদ্রাহীনতাকে অনেকাংশে দূর করতে পারলেও- ক্রনিক নিদ্রাহীনতা কেবল এই নিয়ম বা সাবধানতার দ্বারা সমাধান হয় না। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগ হিসাবে তাকে নির্মূল করার সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত। মূলত তার নিদ্রাহীনতার সাম্প্রতিক বা দূরবর্তী কোনো কারণ, শরীর-মন ও এই সমস্যার পারস্পরিক প্রভাব, রোগীর সার্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার মাধ্যমে ক্রনিক সমস্যাটার সমাধান করতে হয় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি বরঞ্চ তাকে ফলপ্রসূ রূপে আরোগ্য করতে পারে বলে বাস্তব ক্ষেত্রে বহুলভাবে প্রমাণিত।

নতুন মুখ

গত ১৭/০৫/২০২২ তারিখে জন্ম নেওয়া নবজাতক সাইফ আল মিরসাবের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন পিতা মামুনুর রশীদ ও মাতা মাসুমা বেগম।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু হতে পারে জাতির সম্পদ

জোবায়ের হাসান

আজমল বিন শফিককে বিশেষ সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন আপন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সুলতানা রাজিয়া।

আজমল বিন শফিক (১৪) মানসিক বাধাগ্রস্ত ও মৃগিরোগী হয়েও ভিডিও এডিটিংসহ নানা প্রযুক্তিভিত্তিক কাজ করতে পারে। এজন্য তাকে আপন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঢাকার উত্তরায় আয়োজিত (৮ জুলাই) আপন শিশুমেলা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ পুরস্কারটি আজমল ও তার মা শারমিন খানমের হাতে তুলে দেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. সুলতানা রাজিয়া।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। এই পরীক্ষা বিভিন্নভাবে হতে পারে। সৌন্দর্য, অর্থ, সম্পদ, সন্তান, সম্মান ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে আল্লাহ পরীক্ষা নেন। বিকাশ বাধাগ্রস্ত (প্রতিবন্ধী) সন্তানও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট পরীক্ষা। এটা যে কী পরীক্ষা সেটা যার এমন সন্তান আছে সে ছাড়া কারো পক্ষে পুরোটা বোঝা সম্ভব নয়। একটি প্রতিবন্ধী সন্তানকে সারা জীবন বাবা-মাকে বয়ে চলতে হয়। অনেক বাবা-মা মনে করেন, বিকাশ বাধাগ্রস্ত বা অটিস্টিক সন্তান বোধহয় তাদের পূর্বের কোন পাপের ফল। এমন কোনো কথা আল্লাহ বা রসুল কোথাও বলেননি। তাই এই ধারণা করা ঘোর অন্যায় ও অযৌক্তিক। কেননা অনেক সুস্থ সন্তানও বাবা-মাকে এতটা কষ্ট দিতে পারে যা প্রতিবন্ধী সন্তান দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সুস্থ সন্তানই পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। আজ সমগ্র বিশ্বে যে ভয়াবহ অশান্তি চলছে, তা তো সুস্থ সন্তানরাই করছে। আবার কোন কোন বাবা-মাকে আজীবন নিঃসন্তান হয়ে থাকতে হয়। বস্তুত ধৈর্যহারা না হয়ে কে কতটা সবর ধারণ করতে পারেন, আল্লাহর শোকর গুজার করতে পারেন সেটিই মুখ্য বিষয় এবং তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তীর্ণ। সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ায় আল্লাহর উপর কখনও নারাজ হওয়া যাবে না, বিরক্ত হওয়া যাবে না।

যদিও একটি বিকাশ বাধাগ্রস্ত সন্তানকে সারাজীবন ধৈর্য ধরে বহন করে চলার উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু বাস্তবে মেনে নেওয়া অনেক কঠিন। তারপরও সমাধান একটিই, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কাল, সবসময় এই

প্রত্যাশা করা যে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন; তিনি যেন সব সহজ করে দেন। প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা-মাতারা এক প্রকার হীনম্মন্যতায় ভুগেন। নিজ সন্তানকে তারা অন্যের সামনে আনতে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু সকল সন্তানই আল্লাহর আমানত। তাই এই বিশেষ আমানত রক্ষার জন্য মনোবল বাড়াতে হবে, সব সময় মনে রাখতে হবে এটা আল্লাহর পরীক্ষা। আর পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাকে কোনো উত্তম বদলা দিবেন।

বিকাশ বাধাগ্রস্ত সন্তানের বাবা-মায়ের সাথেও তাদের সন্তান সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা বা আচরণ করা যাবে না, যাতে তারা কষ্ট পায়। কোনো কোনো সন্তান হয়তো কাজের সময় বাবা-মাকে বিরক্ত করে থাকে। এজন্য তার উপর কখনও বিরক্ত হওয়া, তাকে ঝামেলা মনে করা, তার গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়। কারণ, সে তো এটা ইচ্ছাকৃত করছে না। শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কারণে করছে। বরং তার প্রতি আরো বেশি সহানুভূতি বাড়ানো উচিত। মানুষ চাইলে সহানুভূতি, স্নেহ, করুণা এবং এমন মানবিক গুণকে অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারে। অনেক পরিবারে দেখা যায় বিকাশ বাধাগ্রস্ত সন্তানের পোশাক, খাবার, থাকার জায়গা অন্য সুস্থ সন্তানদের তুলনায় অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের সন্তানদের বেলায় ইনসাফ কর" (বোখারি ও মুসলিম)। ইসলামের শরিয়াহ মোতাবেক, কোনো পিতা এক সন্তানকে বেশি অপর সন্তানকে কম সম্পদ দান করতে পারেন না। কারণ এটাও এক প্রকার জাহেলিয়াত।

আমাদের আন্দোলনের অনেক শিশুই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই এখন সকলের পরিচর্যা ও সহযোগিতায় আন্দোলনের কাজে অংশ নিচ্ছে এবং অনেকে বেশ ভালোও করছে। তাদের অনেকেই মেধাবী। তবে তাদের সেই মেধাকে কাজে লাগানোর জন্য আশপাশের সকলের বিশেষ সহযোগিতা দরকার। পৃথিবীতে এমন অনেক গুণী ব্যক্তি রয়েছেন যারা জন্মগত বা শারীরিকভাবে বিকৃত হয়েও অসাধ্য সাধন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং।

আল্লাহর রসুলের (সা.) সময়েও এক অন্ধ সাহাবী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)। একদিন রসুলাল্লাহ (সা.) মক্কার বড় বড় কাফের নেতাদের বালাগ দিচ্ছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবী উম্মে মাকতুম (রা.) এসে রসুলের (সা.) কাছে পবিত্র কালাম শিখতে চাইলেন। অনুপযুক্ত সময় আসায় রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁর দিকে ভ্রু-কুঞ্চিত করে তাকালেন। রসুলাল্লাহর এটুকু বিরক্তিপ্রকাশও আল্লাহ ভালোভাবে দেখলেন না। তিনি তাঁর রসুলকে কঠিন ভর্ৎসনা করে আয়াত নাজিল করলেন,

"তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ তার উপকার হত। পক্ষান্তরে যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায় নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে (সুরা আবাসা ১-১২)"।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রা.) ও মুস'আব ইবনে উমায়েরকে (রা.) রসুলাল্লাহ হিজরত হওয়ার আগেই মদিনার বাসিন্দাদেরকে তওহীদের ডাক ও কোর'আনের শিক্ষা প্রচারের জন্য জন্য মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। উম্মে মাকতুম (রা.) এবং বিলাল ইবনে রাবাহ (রা.) মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। মহানবী (সা.) যখন কোনো যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মদিনা ত্যাগ করতেন, তখন প্রায়ই তিনি উম্মে মাকতুমকে (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত

ও মসজিদের ইমাম হিসাবে রেখে যেতেন। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। মানুষকে তিনি বলতেন, 'আমার হাতে পতাকা দিয়ে তোমরা আমাকে দু'সারির মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি অন্ধ, পালানোর কোনো ভয় নেই।'

উম্মে মাকতুমের মতো ইতিহাস আমাদের আন্দোলনেও রচিত হতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন বিকাশ ব্যহত সন্তানদের প্রতি আমাদের সঠিক সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। আর প্রয়োজন তাদের সুস্থতা ও মানসিক-শারীরিক বিকাশের জন্য সঠিক চিকিৎসা। এজন্য মাননীয় এমাম আপন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের আন্দোলনে কোন বিকাশ বাধাগ্রস্ত শিশু যেন অবহেলিত না থাকে সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা জরুরি।

নতুন মুখ

গত ৩১/০৭/২০২২ ইং তারিখ রোজ রবিবার ঢাকার আশুলিয়া শাখার মোজাহেদ মো. শামিম হোসেন ও মোজাহেদা মোসা: মর্জিনা বেগম দম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে মোসা: সায়মা আক্তার। শিশুটির বাবা-মা দোয়া চেয়েছেন যেন সায়মা বড় হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

নুতন মুখ

গত ২৮/০৬/২০২২ইং তারিখে যাত্রাবাড়ি শাখা আমির মো: অলিউল্লাহ খান ও সিফাত আলম তৃশার ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে আনজুম আফরা। আফরার বাবা-মা সকল আত্মার ভাই-বোনদের কাছে দোয়া চেয়েছেন, আফরা যেন একজন বীর মোজাহেদা হতে পারে।

নুতন মুখ

ময়মনসিংহ জেলার মোজাহেদ মো. আক্তারুজ্জামান (উজ্জ্বল) ও মোজাহেদা মোছা: মারুফা আক্তার তৃপা দম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে আরফা ইবনাত। আল্লাহ যেন নবজাতককে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী মোজাহেদ হিসেবে কবুল করেন।

নতুন মুখ

গত ১৯/১১/২০২১ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার ঢাকার তেজগাঁও শাখার মোজাহেদ রমজান আলী ও মোজাহেদা জোনাকী আক্তার মীম দম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে রোহিনা বিনতে রমজান। শিশুটির বাবা-মা দোয়া চেয়েছেন যেন রোহিনা বড় হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

নোয়াখালীতে জুম'আ ও আমার উপলব্ধি প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের

মো. সাইদুর রহমান সনি

সোনাইমুড়ী শহীদী জামে মসজিদে জুমার সালাহ শেষে সকল মুসল্লির সাথে মুছাহফা করেন মাননীয় এমাম। ছবিতে মাননীয় এমামের সাথে মুছাহফা করছেন লেখক।

আমি ও আমাদের ঢাকা বিভাগের কয়েকটি শাখা মিলে মোট ৩৪ জন ভাই-বোন গত ১৭ জুন নোয়াখালী সোনাইমুড়ী শহীদী জামে মসজিদে জুম'আ সালাহ করতে যাই। যাবার পরে মাননীয় এমাম আমাদেরকে নিয়ে নোয়াখালীতে কোথায় কী হয়েছিল, আমাদের কোথায় কী প্রকল্প, স্কুল, কররানিসহ সব নিজে সাথে থেকে বর্ণনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। তারপর আমরা রাতে যার যেখানে শোওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে সেখানে চলে গেলাম। সকালে আবার একটু ঘুরাঘুরি করে দিনের বেলা ভালোভাবে আমাদের কার্যক্রমগুলো আরেকবার দেখে জুম'আর সালাহ আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলাম।

যথারীতি মাননীয় এমাম জুম'আর সালাতের পূর্বে খুতবাহ প্রদান করলেন। তারপর জুম'আর সালাহ করালেন। এরপর আমাদেরকে এক ঘন্টা সময় অতিরিক্ত দিতে বললেন। তখন সেখানে নোয়াখালীর স্থানীয় লোকজনসহ আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম।

মাননীয় এমাম আমাদের সবার উদ্দেশে বললেন, আপনারা এই মসজিদের নাম কেন শহীদী জামে মসজিদ রাখা হয়েছে তা জানেন? এখানে আমাদের দুইজন ভাইকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের রক্তের উপরে আমাদের মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। ওখানে উপস্থিত নোয়াখালীবাসীকেও জানালেন আমরা কারও কোনো ক্ষতি না করা সত্ত্বেও আমাদের উপর কেন বারংবার হামলা করা হয়েছে, কেন আমাদের দুইজন ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

তারপর মাননীয় এমাম মাইকে চিৎকার করে সবার সামনে বললেন: "আমারা এখানে এসেছি-ই

এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। নিজেদের ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পত্তি, স্ত্রী, সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ত্যাগ করে আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহর প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠানো সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাতে আমাদের জীবন থাক আর যাক, আমরা এটা করেই ছাড়বো। যদি এর জন্য আবারও সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়, তবুও দিব। কিন্তু পিছু হটবো না।" এই আলোচনার সময় মাননীয় এমামের পবিত্র মুখ, তাঁর দুই চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল ও পানি টলমল করছিল।

মাননীয় এমামের পুরো আলোচনা শোনার পর শেষে বিদায় নেবার সময় মাননীয় এমাম আমার সাথে মুসাহফা করার সময় বললেন, তুমি ঢাকার টিম না? ঢাকা থেকে এসেছো না? আমি বললাম, জ্বি মাননীয় এমাম। তখন মাননীয় এমাম বললেন, "ঢাকার ওদেরকে বোলো, আমি বোধহয় ওদেরকে বোঝাতে পারছি না। ঢাকাতে ওরা (মোল্লারা) কিছু করবে এটার সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারণ ঢাকার আর গ্রামের পরিবেশ এক না। ঢাকার মানুষ যার যার মতো সে সে থাকে। সেখানে পুরো জনগণকে একত্রিত করে কিছু করা এতো সহজ না। আর ওদের দৃষ্টিও ঢাকাতে থাকলেও তার চেয়ে বেশি নোয়াখালীতে। সুতরাং এখানে যে ওরা কিছু করার চেষ্টা করবে এটার শতভাগ সম্ভাবনা তৈরি হয়ে আছে। ঢাকার ভাই-বোনেরা সম্ভবত বুঝতে পারছে না। আমি ওদেরকে বোঝাতে পারছি না যে, এখানে ওরা আক্রমণ করবেই করবে। এতখানিই সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় এমামের সাথে জুম'আ করে ও পরবর্তী পুরো আলোচনা শুনে এবং বিদায়ের সময় বলা কথাগুলো শুনে আমার কাছে শুধু এটাই বার বার মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের মাননীয় এমামের আত্মার ক্রন্দন, আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য তাঁর বুকের ভেতরে জমে ওঠা হাহাকার, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁর ব্যাকুল আর্তনাদ, আমাদের শহীদ ভাইদের রক্তের মূল্য- কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না, উপলব্ধি করতে পারছি না। না পারছি মাননীয় এমামের আত্মার চাওয়া বুঝতে, না পারছি আমাদের ২৭ বছরের অপেক্ষার মূল্যায়ন করতে। যেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য আমরা ২৭ টি বছর ধরে বিভিন্নভাবে সংগ্রাম করছি, সেই সময়কে সামনে পেয়ে এখন সবাই বুদ্ধিহীন স্থবির হয়ে গেছি, বুঝেও বুঝতে চাইছি না। ইবলিসের দেয়া দুনিয়াবি পর্দা চোখের সামনে দেখেও তা ছিন্নভিন্ন করে মাননীয় এমামের চাওয়া পূরণে আমি অক্ষম হয়ে গেছি। নিজের, নিজ জাতির, নিজ সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমি যেন আজ দুনিয়ার কাছে পরাজিত।

দুনিয়া শব্দের যে অর্থ আমরা শিখেছি, আজ সেই দুনিয়া আমাদের জীবনকে চেপে ধরেছে, আমাদের পায়ে শেকল বেঁধে দিয়েছে। উঠতে, বসতে সব সময় মনে হচ্ছে, আমরা যদি মাননীয় এমামের ডাকে সাড়া না দিই তাহলে হেযবুত তওহীদ নয় কেবল, আমি বলব আমার বা আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আর কোনো উপায় থাকবে না, যদি আমরা নোয়াখালীকে রক্ষা করতে না পারি। কারণ আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু এখন নোয়াখালীতে, আমাদের ভিত্তি এখন নোয়াখালীতে। যদি সেখানে ওরা আক্রমণ করে তবে তার ফলাফল যেটাই হোক, তার প্রভাব পুরো হেযবুত তওহীদকে, অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে ও তাদের সন্তানদেরকে, আমাদের মেয়েদেরকে বহন করতে হবে। আল্লাহ না করুক আমরা মাননীয় এমামের ডাকে সারা না দিলে যদি শাস্তি হিসাবে আল্লাহ আমাদেরকে পরাজিত করেন তবে আমরা স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন নয়, বেঁচে থাকতে পারবো কি না আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ ২৭ টি বছর ধরে আমরা যেভাবে ইসলামের বিকৃতি ও ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে প্রচার করেছি, তাতে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ ধ্বংস হয়েছে। তাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের মতো হয়ে আছে। আমরা পরাজিত হলে বাংলাদেশের সর্বত্র তারা সেই হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

সুতরাং সময় থাকতে আমাদের যাদের সাধ্য আছে, আত্মার আকুল আকাঙ্ক্ষা আছে তাদের অবশ্যই মাননীয় এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে সব ছেড়ে বের হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা, এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহকে তার সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেবার জন্যই না, হেযবুত তওহীদ ও আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্ন, নোয়াখালীতে ভাই-বোনদের রক্ত পানি করা উপার্জনের দ্বারা সমস্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রশ্ন, শুধু তাই নয় মানুষ নামের এই জাতিকে বিপথে থেকে ধ্বংস হবার হাত থেকে রক্ষা করার প্রশ্ন।

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কবুল করুন। আমীন।

মাননীয় এমামের পেজে করা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট

১. মাননীয় ইমাম, সালামু আলাইকুম। আমার বিনীত অনুরোধ, দয়া করে আপনি অতিসত্বর সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিন- তাদের দান-খয়রাতের কোন টাকা যেন মাদ্রাসা এবং মসজিদে না দেওয়া হয়, আমাদের ভিক্ষার পয়সা তারা খেয়ে-পরে আমাদেরই সম্পদ বিনষ্ট করবে, আমাদের দেশের সম্পদ নষ্ট করবে, সেটা হতে পারে না। প্লিজ, আপনি সুন্দর করে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন। আপনাকে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি কথাগুলো জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। আমরা আর এসব দেখতে চাই না। তারা কোটি কোটি টাকার গাড়িতে চড়ে, অন্যের বউ নিয়ে ঘুরবে, আমাদের দানের টাকায় হেলিকপ্টারে নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যাবে মেয়েদের শিল্পা করার জন্য! প্লিজ, আপনি এই পশুদের লাগাম টেনে ধরুন।তা না হলে ইসলাম এই জালিমদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা দেশের প্রচলিত সরকার কাঠামো, প্রশাসন, শিক্ষাব্যবস্থা কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। বিকৃত শিক্ষার কারণে বাংলাদেশের আজ এই হাল। এই নাপাক হুজুরেরা সবাই নিরীহ বাচ্চাদের জঙ্গি শিক্ষা দেয়। এই আলেমরা নিজেদের বিরাট পণ্ডিত মনে করে। আসলে তাদের মধ্যে আপনার জ্ঞানের ছিটে ফোঁটাও নেই। মাননীয় ইমাম, দেখুন আল্লাহ কীভাবে তাদের গর্ব খর্ব করে দিচ্ছেন। অহংকারীকে আল্লাহ্ তায়লা পছন্দ করেন না। ধর্মের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় এক শ্রেণীর আলেমগণ আজ মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে। আমি জানি, আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন। সফলতা আসবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ্য ও সাবের রাখুন।

আমি খুব ভালোভাবেই জানি, মাননীয় ইমাম যে কথাগুলো বলেন এটা শতভাগ সত্য। প্রকৃত ইসলাম এটা। এতে কোন ভুল নেই। আমার পূর্ব-পুরুষেরা আমাদের এই ভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। আমার বাড়ী টাঙ্গাইল। আমাদের বাড়ীর মসজিদে মহিলারাও নামাজ পড়ে। মাননীয় ইমাম একদিন সারা বিশ্বে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

(কাজী তাহমিনা বেগম)

২. সেলিম ভাই, আমার হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা আছে। আমি আপনার অনেক লেকচার শুনেছি। সত্য কথা বলতে সবগুলোই ভালো লেগেছে। আমি একজন জ্ঞানী লোকের আদর্শ নিতে চাই। আপনার কথা বলার ভঙ্গি, মেইন মেইন টপিক নিয়ে আলোচনা করা; এই সত্য কথাগুলো আজ আমাদের সমাজে পাই না। দীন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, এতে সাধারণ লোক ধোকায় পড়ছে। ফলে আপনার কথা মানুষ গ্রহণ করতে চায় না। মাঝে মাঝে আপনার কথাগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে মন চায়; তবে এক জাতের মানুষ আছে যারা আপনাকে গালমন্দ করে, সে ভয়ে প্রচার করি না।

(সাজ্জাত খান)

৩. সেলিম ভাই, আমি আপনার অনেক ভক্ত। আমার বাড়ি কুমিল্লা জেলার নাথেরপেটুয়াতে। আমি হেযবুত তওহীদ আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি, আরও জানতে চাই। আমার হেযবুত তওহীদের প্রতি বিশ্বাস আছে। আমার ইচ্ছা সবাই যেন হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে জানুক। প্লিজ ভাই, আমাকে আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিন। বাংলাদেশে হেযবুত তওহীদের মতো কোন সহিহ দল নেই।

(প্রিন্স রাজীব হাওলাদার)

৪. দাদাভাই, প্রথমে আমার শুভেচ্ছা এবং অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা নিয়েন। আপনি আমি বেঁচে আছি সেজন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ কারণ আপনাকে এই সমাজের অনেক দরকার। এভাবেই সব নবী-রাসুলগণ এসেছেন এবং প্রত্যেকেই একটা জাতি তৈরি করে দিয়েছেন। তারা এভাবেই এমন একটা শান্তিময় সমাজব্যবস্থা প্রবর্তণ করে দিয়ে চলে গেছেন। ঠিক সেভাবে, যখন সমগ্র পৃথিবীময় এই মহামারী বিশ্বজুড়ে একটি গোলযোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেই সময়ে আপনার এই হেযবুত তওহীদের আবির্ভাব হয়েছে। সেজন্য আমি আরো স্মরণ করছি, এনামুল জামান সাহেবকে তাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। আমি তার ভিডিও দেখেছি এবং এতোটা আপন মনে হয়েছে যেটা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না, ঠিক সেভাবেই আপনিও আমার অন্তরের অন্তস্তলে গেঁথে গেছেন। এতটাই আপন মনে হচ্ছে, সেটা আসলে মুখে বলে বোঝানো সম্ভব না। এটা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। জানিনা কীভাবে, তবে যাইহোক অনেক বাধা-বিপত্তি থাকবে তারপরও আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে কাজ করতে হবে। এখন আমার কথা হচ্ছে, দাদাভাই আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। কথা বলবো আপনার সাথে। ধন্যবাদ

মাননীয় এমামের বক্তব্য শুনে শিহরিত হয়ে মনে হচ্ছে যেন এই পাপী মন, এই পাপী একজন মানুষ একটা ভালো পথে এসে সমগ্র মানুষকে যেন জোরে জোরে বলতে পারি যে, এটাই সত্যদীন। যেটা আপনারা হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠা করছেন।

(জিকো মন্ডল)

দক্ষ ড্রাইভার চাই

যোগাযোগ:
০১৭০৭০৭৭০০১

ইকরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ

প্রোঃ মোঃ ইমরুল কায়েস

মোবাইল নাম্বারঃ ০১৭১১-০৬৯৪৫১, ০১৯১৩-১৭৫৭১৫

স্থানঃ চাষীরহাট, নতুনবাজার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

এখানে যাবতীয় চায়না ইঞ্জিন মেরামতের কাজ, অটো গাড়ি রিপেয়ারিং ও ক্রয়-বিক্রয় করা হয় ও গ্রিল, সার্টার, দরজা, জানালা, উইনডো ইত্যাদি লৌহ ও স্টিলজাত দ্রব্য তৈরি ও মেরামত করা হয়। বাসা বাড়িতে গিয়ে ওয়েল্ডিং ও রং করা হয়, গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয়। এছাড়া এখানে এস এস দিয়ে দরজা, জানালা ও বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়।

সেলিম'স ক্লিনিক

বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথিকৃৎ, উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক
ডা. মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি চিকিৎসালয়।

উপশম নয়
নিরাময়ই কাম্য

হেড অফিস
বাসা নং -৫১, রবীন্দ্রসরণী, এবিসি নর্থরিজ (২য় তলা), সেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৪৪১৭৬৭৯৮

বরিশাল শাখা
আমিন কমপ্লেক্স (৫ম তলা) ইছাকাঠী প্রধান সড়ক, কাশিপুর বাজার, বরিশাল।
ফোন: ০১৭৫৭৭০১৩২২

রংপুর শাখা
আঁচল ভবন,কলেজ রোড (বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন) আলম নগর, রংপুর।
ফোন: ০১৭০৫৯০১৩৯২

ময়মনসিংহ শাখা
১০২/৩ কালীবাড়ী রোড, বলাশপুর, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ সদর।
ফোন: ০১৬৩৬২১৫৭৫৮

নোয়াখালী শাখা
পোরকরা, চাষীরহাট, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
ফোন: ০১৮৭১৭১২১০০

মেহেরপুর শাখা
নিশিপুর জামে মসজিদ, গাংনী, মেহেরপুর।
ফোন: ০১৭৩৭৩৯৫৬৯৮

সম্পাদক | মো. রিয়াদুল হাসান
বিজ্ঞাপন | মো. আসাদ আলী
প্রতিবেদক | সাঈদ বিন তারিক, হাসান মাহদী, শাহাদাত হোসাইন, জোবায়ের হোসেন
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ | ওবায়দুল হক বাদল, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, রাকিব হোসেন